সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জানুয়ারি ২০১৪

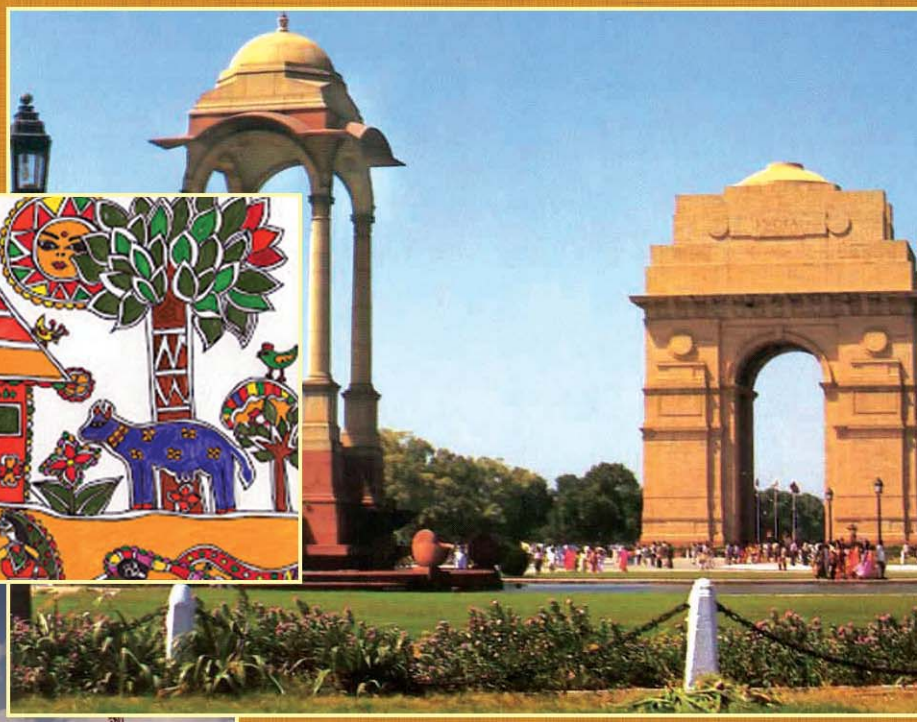

মধুবনি পেইন্টিং
বদলে যাচ্ছে ভারত
ভারতের মহাকাশপ্রযুক্তি
ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন

১১ জানুয়ারি ২০১৪
ভারতবাংলা দেশ শিল্প ও বণিক সমিতির নতুন পরিচালকমণ্ডলীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মাননীয় হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

১৬ জানুয়ারি ২০১৪
ভারত সরকারের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাকি থেরাপি, এইচডিআর ইউনিট ও ফোরডি আ ল্ট্রা সাউন্ড ইউনিটের চিকিৎসা উপকরণসমূহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

১৮ জানুয়ারি ২০১৪
গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বৃত্তির চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এ কে এম মোজাম্মেল হক, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মাননীয় হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন এবং হাই কমিশনের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার পি সি থিমাইয়া

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চলিশ | সংখ্যা ০৯ | পৌষমাঘ ১৪২০ | জানুয়ারি ২০১৪

মধুবনী পেইন্টিং

বোটানিক্যাল গার্ডেন

সূচিপত্র

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ মানবতাবাদী দার্শনিক ০৪
মধুবনী পেইন্টিং ১০
শ্রীরামকৃষ্ণবি বেকানন্দ ॥ গুরুশি ষ্যের সরস প্রকাশ ১২
বদলে যাচ্ছে ভারত ১৫
ছোটগল্প: সম্পত্তি ১৮
কবিতা ২৪
ভাগ করে নেওয়া ইতিহাসের সঙ্গে আট দিন ২৬
আকাশের ঠিকানায় ভারতের মহাকাশপ্রযুক্তি ২৮
ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন ৩১
উপন্যাস: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩৪
অনুবাদ গল্প: জনৈক ভারতীয়র মৃত্যু ৩৮
ছোটগল্প : মন্বন্তর ৪৫
শেষ পাতা: ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জন্ম ৪৮

স্বামী বিবেকানন্দ মানবতাবাদী দার্শনিক

১৮৯৭ সালের ১ মে তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনের যাত্রা শুরূ হয় কলকাতায় বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকায়ও প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন। মানবসেবার বহুমুখী দরজা খোলা রেখে স্বামী বিবেকানন্দ মানবতাবাদী কর্মের ইতিহাসে যে অনন্য নজির স্থাপন করেন, তার ফলশ্রূতিতে ভারতের সর্বত্র রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার সংখ্যা ৮৩টি। ভারতের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১টি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ৪১টি মঠ, ৫০টি মিশন ও ২১টি যুক্ত মঠমিশন মানব কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষকে ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ কাজ করে গেছেন আজীবন। তাঁর জীবনদর্শন ছিল পৃথিবীর সকল মানুষের, সকল সমাজের, সকল শ্রেণির সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, যার ফলে মানুষ হয়ে উঠবে যথার্থ মানুষ, আলোকিত মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Iccr Dhaka

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

প্রসঙ্গ নজরুল ও বারীন্দ্র

ভারত বিচিত্রার আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৩ সংখ্যায় মানবর্দ্ধন পালের *বিদ্রোহী নজরুল ও বিপ্লবী বারীন্দ্র: সখ্য ও স্বাতন্ত্র্য* শীর্ষক লেখাটি পড়ে অতীব আনন্দিত হলাম। এরকম বিশেষণধর্মী লেখা তথ্য এবং বিচার-বিবেচনায় একটি অনন্য আলেখ্য বটে।

সামান্য লেখাপড়ার সুবাদে যে প্রশ্নগুলি আমার মনে জবাববিহীন হতাশায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল তা যেন সহসাই মানবর্দ্ধন পালের লেখনীর মাধ্যমে মুখর হয়ে উঠল। কিছু প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেছে, তার প্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা।

প্রথমেই ধরা যাক, নজরুলের *বিদ্রোহী* কবিতা বাংলায় যে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিবেশের জন্ম দেয়, তার একটি নান্দনিক বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। নজরুল *ধূমকেতু* পত্রিকার জন্য আশীর্বাদ আনতে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে কবি বলেছিলেন 'তুমি যে তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁচতে শুরু করেছ।' অর্থাৎ, এক দুঃসাহসী লেখনী দিয়ে দুর্গমপথে যাত্রা শুরু করেছিলেন নজরুল। শুধু কি তাই, *ধূমকেতু* পত্রিকার জন্য কবি যে আশীর্বাণী লিখেছিলেন তাতেও অগ্নিগর্ভ ভবিষ্যতের জন্য 'আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু' বলে হিংসা-বিদ্বেষজর্জর দুর্দশাগ্রস্ত জাতিকে জাগিয়ে দিয়ে 'দুর্দিনের দুর্গশিরে বিজয় কেতন' ওড়াবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আর সেই বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করি ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল তক দ্বিজাতিতত্ত্বের অপ্রতিরোধ্য বাস্তব পরিণতির মধ্যে। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বাঙালিদের মধ্যে এমন তীব্র রূপ ধারণ করল যে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার বায়ু বাংলার জল বাংলার মাটি বাংলার ফল' গানটি যেন 'দুর্বিসহ মাতালের প্রলাপে'র মত শোনাল। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বাংলাদেশের অধিবাসীরা সত্য ও সুন্দরের প্রতি, সাম্য ও মৈত্রীর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার মোহে বাঙালির আবহমান-কালের সুখে-দুঃখে সহাবস্থানের ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করল। সেই হিংস্রতাকে আলিঙ্গন করে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মাঝে তারা কি আজও পরস্পরে মুখ ফিরিয়ে থাকবে?

নজরুল হিন্দু-মুসলিম মিলনে বিশ্বাসী ছিলেন। লর্ড কার্জনের দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষকে উৎপাটিত করতে এবং শাসক ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে যাঁরা সচেষ্ট ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেই তিনি একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাই বারীন ঘোষের মত বিপবীদের সঙ্গে তাঁর যেমন সখ্য গড়ে ওঠে, কমরেড মুজাফফর আহমদের মত মার্কসবাদীদের সঙ্গেও গড়ে ওঠে মিতালী। অগ্নিযুগের ঋষি অরবিন্দ, ব্যারিস্টার পি মিত্র প্রমুখ বিপবীরা ব্রিটিশ শাসন-অবসানে হিংসার পথ বেছে নিতে কার্পণ্য করেননি। নজরুলও এই হিংসার পথ বেছে নিলেন। *বিদ্রোহী* কবিতার ঝংকারে দেশপ্রেমিক তরুণরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো' বাদ দিয়ে 'আমি মানি নাকো কোন আইন' বলতেই বেশি সোচ্চার হলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের *নারায়ণ* পত্রিকার জন্য লেখা নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট' গানটি যেন চমক সৃষ্টি করল বিপবী তরুণদলের দুর্গম পথ-পরিক্রমায়। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার/ লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার', অসাম্প্রদায়িকতার বজ্রনির্ঘোষ 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন?' প্রভৃতি লেখা ছিল সমসময়ের আলেখ্য। অচিরেই এ-সব লেখা দূরদর্শী চিত্তরঞ্জন ও তরুণ পরিচ্ছন্ন নেতৃত্বের পুরোধা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হল। এটি রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়ে। তাই নজরুল গ্রেফতারের পর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অনশন শুরু করলে শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করে অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ জানান। 'Our literature claims you' কথাটি লিখতেও রবীন্দ্রনাথ ভোলেননি।

অপরদিকে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আইন ১৯১১ সালে রদ হলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি হয়, তার সূত্র ধরে ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন এবং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পার্লামেন্টে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু তত্ত্বে সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিমশ্রেণির উদ্ভব হতে শুরু করে। পাশাপাশি ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপবীদের আক্রমণও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ এবং ১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্য সেনের সশস্ত্র অভিযানে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঘটনাপ্রবাহের আবর্তে নজরুল 'একহাতে মোর বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতুর্য' যেমন লিখেছেন, তেমনি গান্ধীবাদে অনুরক্ত হয়ে 'চরকা' নামে কবিতাও লিখেছেন; খদ্দরের গান্ধী-টুপিও শিরোভূষণ করেছেন। হতাশ মুসলিম রাজনীতিবিদরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করে কংগ্রেস ও স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দলসমূহের ব্রিটিশ-বিরোধী ভূমিকার বিপরীতে ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নজরুল এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বাঙালি মুসলমানদের অবিসংবাদী নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের তীব্র সমালোচনা

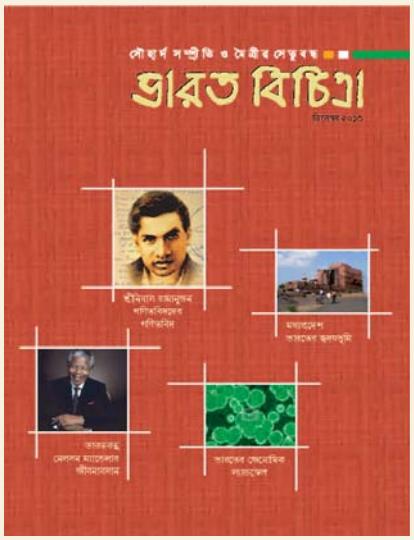

করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেস ব্রিটিশদের সাহায্য ও সমর্থন করতে অসম্মতি জানিয়ে স্বাধীনতার দাবিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড় আন্দোলনে'র ডাক দেয়। অন্যদিক মুসলিম লিগ ইংরেজদের সমর্থন করে। যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাদানে সম্মত হয়। তবে চার্চিল প্রমুখ টোরি দলের নেতারা বিরোধিতা করেন। ফলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ উস্কে দিতে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় যে ভয়ংকর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টি হয়, তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভারত ভাগ।

রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ সালে প্রয়াত হন। নজরুল ১৯৪২ সাল থেকে রোগাক্রান্ত, নেতাজী সুভাষও অন্তর্হিত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। ঋষি অরবিন্দ, বারীন ঘোষ ধর্মের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ। তাই বাংলার রাজনীতি তমসাবৃত। কলকাতার দাঙ্গার পরে তা বিস্তার লাভ করে নোয়াখালী, বিহার, লাহোর, ডেরা ইসমাইল খান, করাচি প্রভৃতি জায়গায়। সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান শিখায় ভারতের আকাশ-বাতাস দগ্ধ, হিন্দু-মুসলিমের রক্তে সিন্ধু-গঙ্গার জল রঞ্জিত। সেই দুর্দিনে বারীন ঘোষ বিশ্বাসঘাতকতা করে অগ্রজ ঋষি অরবিন্দ ও অন্যান্য বিপবীদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচতে আন্দামানে দ্বীপান্তর বেছে নেন।

১৯৫১ সালে ব্যারাকপুরে এক পূজামণ্ডপে বারীন ঘোষকে দেখার সুযোগ পেয়ে গভীর শ্রদ্ধার মাথানত করেছি বীর বন্দনায়। ২০১২ সালে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (৪র্থ খণ্ড) পড়তে গিয়ে সেই শ্রদ্ধা বিনষ্ট হল। সেই বারীন ঘোষকেই কিনা নজরুল উৎসর্গ করেছেন তাঁর *অগ্নিবীণা* কাব্য!

সমীররঞ্জন শীল, নিকেতন আবাসিক আ/এ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

সম্পাদকীয়

এই শীতের দেশে কুয়াশাজড়ানো ভোরে যেমন পুব আকাশে প্রথম দিনের সূর্য রক্তিমাভা ছড়িয়ে বলে, 'ওঠো জাগো। আর কত ঘুমাবে?' তেমনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষ শতবর্ষ আগে একইভাবে নিদ্রাতুর ভারতবাসীকে সুষুপ্তি ভেঙে জেগে উঠবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে তিনি বুঝেছিলেন, দরিদ্রকে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে হবে, তারপর ধর্মকথা। তিনি বুঝেছিলেন, এই দারিদ্র্যের মূলে আছে পরাধীনতা। তাই সবার আগে চাই স্বাধীনতা। তিনি ভারতবাসীকে বীর্যবান হতে বলেছিলেন, সংগ্রামী হতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলা ভাল। একজন ধর্মনেতার মুখে এহেন বাণী শুনে আমরা বিস্মিত হই বটে কিন্তু এর তাৎপর্যও বুঝতে পারি। স্বাধীনতার জন্য চাই সুগঠিত শরীর, সুস্থ মন। তাঁরই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত আরেক তেজোদ্দীপ্ত যুবাপুরুষ বলেছিলেন, 'রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। ভাবতে অবাক লাগে, মাত্র ঊনচলিশ বছর আয়ুষ্কালে তিনি যে বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন, তা আজ শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দুর্গত মানুষকে অকৃপণ সেবায় সুস্থ করে তুলছে। এই মহাপ্রাণ মানুষটি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তরুণ প্রাণের এই মহান গুরু জন্মেছিলেন ইংরেজি বছরের প্রথম মাসে, এক শীতের দিনে। তেজোদ্দীপ্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মও এই মাসে।

যদি পিছিয়ে যাই আরো ১৯০ বছর, তাহলে দেখব যশোরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে কপোতাক্ষতী রে এমনই শীতের দিনে আরেক মহাকবির জন্ম হচ্ছে– বিদ্রোহই ছিল যাঁর যাপিতজীবনের অনুষঙ্গ। বেঙ্গল রেনেসাঁর সেই আদিপুরুষ আমাদের চৈতন্যে অভিঘাত হেনে রামচন্দ্রের বিপরীতে রাবণকে নায়ক চরিত্রে দাঁড় করালেন। বাঙলা দেশে, বাংলা সাহিত্যে, বাঙালির মননে সেই প্রথম বিদ্রোহ।

ইংরেজি বছরের প্রথম মাসটি শুধু যে কয়েকজন মহান বিপ্লবীর জন্মদিনে খচিত, এমত নয়– এই মাসেই এক শীতে-মোড়া সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এক নির্বোধ চন্দ্রাহত যুবকের বুলেটের আঘাতে। যে ভারতবাসী ছিল তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয়, যে ভারতবাসীর জন্য তিনি স্বাধীনতার নতুন সূর্য এনে দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে এমন প্রত্যাঘাত কী তাঁর প্রাপ্য ছিল? সেই বিবেকবর্জিত যুবকের অর্বাচীন কাজে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল গোটা বিশ্ব। আমরা আজও তাঁর অভাব ভুলতে পারিনি। আজও আমাদের সকল কাজে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ তাঁর অভাব অনুভব করি। বুঝি, নয়ন সমুখ থেকে তিনি নয়নের মাঝখানে ঠাঁই নিয়েছেন।

ভারত বিচিত্রার অগণিত পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ ২০১৪।

প্রবন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দ ▮ মানবতাবাদী দার্শনিক

মোহাম্মদ দিদারুল আলম

১৮৯৭ সালের ১ মে তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনের যাত্রা শুরু হয় কলকাতায় বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকায়ও প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন। মানবসেবার বহুমুখী দরজা খোলা রেখে স্বামী বিবেকানন্দ মানবতাবাদী কর্মের ইতিহাসে যে অনন্য নজির স্থাপন করেন, তার ফলশ্রুতিতে ভারতের সর্বত্র রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার সংখ্যা ৮৩টি। ভারতের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১টি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ৪১টি মঠ, ৫০টি মিশন ও ২১টি যুক্ত মঠ-মিশন মানব কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষকে ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ কাজ করে গেছেন আজীবন। তাঁর জীবনদর্শন ছিল পৃথিবীর সকল মানুষের, সকল সমাজের, সকল শ্রেণির সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, যার ফলে মানুষ হয়ে উঠবে যথার্থ মানুষ, আলোকিত মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ।

বিলে ওরফে নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম হয় কলকাতায় ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণের পরে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিতি লাভ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত পেশায় ছিলেন আইনজীবী। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী গৃহিণী। পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের পর নরেন্দ্রনাথ দত্তকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে নবম শ্রেণিতে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি এ স্কুলে ঠিকমত বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। দুই বছর বাবার কর্মস্থল মধ্যপ্রদেশের রায়পুরায় অবস্থান করে পারিবারিক পরিবেশে

গানের অনুষ্ঠানে পরিচয়ের পর থেকেই নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথের জীবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাব বাড়তেই থাকে। অবশেষে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রামকৃষ্ণ অপর কয়েকজন কিশোর ভক্তসহ নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে যান। গুরুর মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথ সংসারধর্ম তাগ করে রামকৃষ্ণ মঠে আশ্রয় নেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনি ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে সন্ন্যাসী বিবিদিশানন্দ/ স্বামীজী প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হতে থাকেন।

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ঐ বছর ওই স্কুল থেকে একমাত্র নরেন্দ্রনাথই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এতে খুশি হয়ে তাঁর পিতা তাঁকে একটি রূপার ঘড়ি উপহার দেন।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পুনরায় অসুস্থতার কবলে পড়েন। উপস্থিতির হার কম থাকায় প্রেসিডেন্সি কলেজ তাঁকে এফ এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি না দেয়ায় তিনি জেনারেল এসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে পাস করেন। অতঃপর একই কলেজ থেকে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বি এ পাস করেন। এ সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। কিছুকাল তিনি মেট্রোপলিটন স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

যতদূর জানা যায়, ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথদের পাড়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের (১৮৩৬১৮৮৬) আগমন ঘ টে। সেখানে এক সংগীতসভায় ভজন গাইলে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নজরে পড়েন। ধর্মীয়সংগীত ও ধর্মশিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অতিশয় মেধাবী ও বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী।

গানের অনুষ্ঠানে পরিচয়ের পর থেকেই নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাব বাড়তেই থাকে। অবশেষে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ অপর কয়েকজন কিশোর ভক্তসহ নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে যান। গুরুর মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথ সংসারধর্ম ত্যাগ করে রামকৃষ্ণ মঠে আশ্রয় নেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনি ভক্তশিষ্য দের মধ্যে সন্ন্যাসী বিবিদিশানন্দ/ স্বামীজী প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হতে থাকেন। অতঃপর ১৮৯১এর দিকে খেতরির মহারাজ অজিত সিং নরেন্দ্রনাথকে স্বামী বিবেকানন্দ নামে ভূষিত করেন। সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি তিন বছরাধিককাল সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। অতঃপর ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগোতে বিশ্ব ধর্মসভায় সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে সঙ্গীত কল্পতরু (১৮৮৭), Karmayoga(1896), Rajayoga (1899), Vedanta Philosophy: An Address Before The Graduate Philosophical Society (1896), Lectures From Colombo to Almora (1897), বর্তমান ভারত (১৮৯৯), My Master (1901), Vedanta Philosophy: Lectures on Jnanayoga (1902), পরিব্রাজক (১৯০৩), ভাববার কথা (১৯০৫) ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উলেখযোগ্য।

১৯০২ সালের ৪ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পরেও তাঁর অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন

নরেন্দ্রনাথ যে সময়টিতে বেড়ে ওঠেন তখন উপমহাদেশের মানুষ একদিকে ছিল দারিদ্র্যপীড়িত, অপরদিকে পরাধীনতা, আর্থসামাজিক অস্থিরতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নীতিহীনতা, সামাজিক ভ-ামী ও শঠতায় নিমজ্জিত ছিল ভারতীয় সমাজ। রামমোহন, রাধাকান্ত, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রমুখের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিনির্ভর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একশো বছরের প্রচেষ্টা যখন ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের ভাগ্য ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছে, ঠিক তখনই নরেন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে স্বামী বিবেকানন্দ যুক্তি, দর্শন ও বিজ্ঞানকে প্রেমের আবরণে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে, ছড়িয়ে দিতে, অপার প্রেমের আলোয় ভারতজনকে আলোকিত করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। তাঁর দর্শনের সৌধ বিনির্মিত হয় জ্ঞান ও প্রেমের যৌথভিত্তির উপর।

বিবেকানন্দের দর্শনে অধিবিদ্যিক ভাবনাটি সম্পূর্ণরূপে বেদান্তদর্শনের ওপর ভিত্তি করে রচিত। বেদান্তদর্শন অনুযায়ী 'ব্রহ্ম'ই মূল বা চরম সত্য। জগৎ মায়া বা মায়ার সৃষ্টি। জগতের মত জীবও ব্রহ্মেরই অংশ। তাই ব্রহ্মের মধ্যে লীনতাই জীবের মুক্তি। বেদান্ত দার্শনিক শংকরাচার্যের মায়াবাদকে তিনি যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলেন। এসময় তিনি গৌতমবুদ্ধের মানবতাবাদেও প্রভাবিত হন। এ জন্য বলা হয়ে থাকে, বিবেকানন্দের ওপর শংকরাচার্যের প্রভাব ছিল মূলত তাত্ত্বিক এবং গৌতমবুদ্ধের প্রভাব ছিল প্রধানত ব্যবহারিক।

বিবেকানন্দ মনে করতেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-এর সৃষ্টির ধারা নিয়তই প্রবহমান। তার আদি বা অন্ত নেই। পশ্চাতে আছে তিনটি সত্তা, প্রথমটি হল অসীম ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি। দ্বিতীয়ত আছেন ঈশ্বর, অপরিবর্তনীয় ও শান্ত। তৃতীয়ত আছে আত্মা যা ঈশ্বরের মতই অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত। ঈশ্বরই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কার্যকারণ ও উপাদান।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-এর সকল কিছুরই উৎপত্তি হয়েছে আদি উপাদান আকাশ হতে। জগতের সকল শক্তি তথা বস্তুর অবিনাশিতার শক্তি, বস্তুর শক্তি কিংবা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অথবা জগতের প্রাণশক্তি যাই হোক না কেন, তা আদিশক্তি প্রাণক্রিয়ার পরিণতি। এই পরিণতিপ্রক্রিয়া চলমান থাকে চক্রাকারে। এই চক্রের শুরুতে আকাশ নিশ্চল ও অব্যক্ত থাকে, তারপর শুরু হয় প্রাণের লীলা, সৃষ্টি করে গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ, নক্ষত্র, তারকা তথা বিশ্বজগত বা প্রকৃতি। লক্ষ-কোটি বছর ধরে নিরন্তর বিবর্তনের ফলে এই বিবর্তন প্রক্রিয়া বিবর্তনের শীর্ষে অবস্থান করার পর শুরু হয় পুনর্বার নেতিবাচক বিবর্তন বা অবরোহণ প্রক্রিয়া।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-এর সর্বত্রই নিয়মের রাজত্ব বিদ্যমান। সবকিছুই একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীনে চলছে। এই সার্বিক নিয়মের ক্রিয়াপরতা দেহ, মন ও আত্মা– সবকিছুকে প্রভাবিত করে। এই নিয়মই মানুষকে সার্বিক নিয়ম বা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে একটি আকারগত সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে। দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের পর মানুষ অনুভব করে যে, কোন বিশেষ অবস্থায় অতীতে যা যা ঘটেছে, ভবিষ্যতে অনুরূপ অবস্থায় তাই তাই ঘট বে। এইভাবেই মানুষ অনুধাবন করে যে, প্রকৃতি সমরূপ, ঐক্যপন্থী, পুনরাবৃত্তিমূলক, বিবর্তনশীল ধারার বাহক।

জগৎ এক না বহু? দৃশ্যমান জগতের নানা রূপ বা ভেদ বিদ্যমান। বিবেকানন্দের মতে, এই ভেদজ্ঞানই মানুষের যত দুঃখয ন্ত্রণার কারণ। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের চারপাশে যে বহুকে দেখছি, অনুভব করছি, বহুকে নিয়েই বসবাস করছি তা কি মিথ্যা– অলীক? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈদান্তিকেরা বলেন, 'এই যে নানা/ বহুকে আমরা দেখছি তা একেরই প্রকাশ', অর্থাৎ এসবই হল সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ, সেই বৃহতেরই বিচিত্র প্রকাশ। উপনিষদে যে মৌলিক একত্বের কথা বলা হয়েছে, এটিই

বিবেকানন্দের কর্মবাদ অনুসারে প্রতিটি কর্মের ফল রয়েছে। কর্ম অবশ্যই কোন না কোন ফল উৎপাদন করবে। আগে হোক বা পরে হোক প্রতিটি কর্মেরই ফল অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী ফল উৎপাদন না করে কোন কর্মই ধ্বংস হতে পারে না। এই কর্মফল ভোগ করার জন্যই মানুষকে জন্ম-জন্মান্তর জন্মচক্রের অবর্তে জন্মগ্রহণ করতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মার মোক্ষ লাভ হয়।

শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ, যেখানে জগতের নানাত্ব, বহুত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে 'মায়া'র ধারণা দ্বারা। বিবেকানন্দ শংকরের অদ্বৈতবাদের মায়াকে ভিন্ন আঙ্গিকে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, মায়া জগৎসংসার কে অলীক বা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় না। তিনি বললেন, 'সংসারে ঘটনা যেইভাবে বর্তমান রহিয়াছে মায়া তাহারই বর্ণনা মাত্র' অর্থাৎ Statement of fact, denial of fact নয়। মায়া অনির্বচনীয় কেননা, 'একমাত্র চরম সত্যকে সৎ বলা যেতে পারে। সেদিক দিয়ে দেখলে অসৎ মায়ার অস্তিত্ব নেই। কাজেই মায়া অসৎ একথা বলা যায় না। কারণ যদি তা হতে হয় তবে মায়া কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সৃষ্টি করতে পারত না। কাজেই ইহা এমন এক বিষয় যাহা সৎও নয় আবার অসৎও নয়। এ জন্য মায়া অনির্বচনীয় বা বাক্য দ্বারা প্রকাশ্য নয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।'

বিবেকানন্দ মায়াকে ব্রহ্মেরই একটি সক্রিয় শক্তি বলে গ্রহণ করেছেন। এ শক্তিরই ক্রিয়ার ফলে এ বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। বিবেকানন্দের কাছে মায়া শুধুমাত্র একটি মতবাদ নয়, এটি সত্যের প্রকাশ। শুধুমাত্র মায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তিনি মায়ার প্রেক্ষিতে জগৎ ও জীবনকেও ব্যাখ্যার প্রয়াস পান। শংকরীয় 'মায়া'দর্শনের বিরুদ্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে, মায়া তিরোহিত হলে জীবজগতের অস্তিত্ব কোথায়? এত মায়াতেই সৃষ্টি। এপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'জীবাত্মাই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, প্রকৃতির ভিতর যাহাই সৎবস্তু তাহাই ব্রহ্ম।'

বেদান্তদর্শনের মূলস্রোতের সঙ্গে সহমত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান দিয়েই মানুষের জৈবগঠন সম্পন্ন হয়েছে। মানুষ হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-র সংশেষিত রূপ বা অণুবিশ্ব। তাঁর মতে, ধাতুর ভৌত পদার্থ, উদ্ভিদজগতের প্রাণশক্তি, জীবের জান্তববোধ– যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং আত্মা মানুষকে যথার্থ মানুষে পরিণত করেছে। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ হল তার আত্মা। এই আত্মার কোন ধ্বংস বা বিনাশ নেই। আত্মা অবিনশ্বর।

মানুষ হচ্ছে প্রকৃতির একটি অংশ। প্রকৃতির বিবর্তন মানুষের বেলায়ও প্রযোজ্য, অর্থাৎ প্রকৃতির অংশ হিসেবে মানুষ বিবর্তন নীতির অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন, 'বিভিন্ন জাতির ইতিহাস এমন যে, এদের উত্থানপতন ঘটে। উত্থানের পরই একটি পতন আসে। পতন থেকে বৃহত্তর শক্তিতে আবার উত্থান ঘটে। এই উত্থান ও পতন সবসময়ই চলমান। ধর্মীয় জগতেও এই একই গতি অস্তিত্বশীল। প্রতিটি জাতির আধ্যাত্মিক জগতে যেমন পতন আছে, তেমনি উত্থানও আছে।' অর্থাৎ মানুষকেও প্রকৃতি ও সমাজের বিবর্তনক্রিয়ার পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়েই প্রগতির পথে ধাবিত হতে হয়।

আত্মার ধারণা, প্রকৃতি, দেহআত্মার সম্পর্ক ইত্যাদি প্রশ্নে বিবেকানন্দের দর্শন উপনিষদজাত তথা বেদনির্ভর (উপনিষদ হচ্ছে বেদের ব্যাখ্যা)। আত্মা সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিকদের গতানুগতিক বক্তব্য হচ্ছে আত্মা মন নয়, কারণ মনের পরিবর্তন আছে, এই ক্ষণে মন একরকম ধারণা করে, পরক্ষণেই তা পরিবর্তিত হয়। মনের অস্থিরতা নামক বৈশিষ্ট্যের কারণেই 'অস্থির মতি' কথাটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আত্মা একটি স্থির, স্থায়ী, অপরিবর্তনশীল, নিত্য সত্তা হিসাবে পরিগণিত হয়। আত্মা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন, 'যা কিছু আত্মা তা প্রকৃতিগতভাবে অবিমিশ্র পদার্থ। অন্য কোন উপাদান এর মধ্যে নেই, তাই এর মৃত্যু হতে পারে না। আত্মা প্রকৃতিগতভাবে অবিনাশী। আত্মা কোন পদার্থ থেকে সৃষ্ট হয়নি। 'আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। সেই আত্মা এমনই এক বৃত্তস্বরূপ, যাহার পরিধি নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু যাহার কেন্দ্র কোন একটি দেহের মধ্যে অবস্থিত এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু।'

বিবেকানন্দের কর্মবাদ অনুসারে প্রতিটি কর্মের ফল রয়েছে। কর্ম অবশ্যই কোন না কোন ফল উৎপাদন করবে। আগে হোক বা পরে হোক প্রতিটি কর্মেরই ফল অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলো অবশ্যম্ভাবী ফল উৎপাদন না করে কোন কর্মই ধ্বংস হতে পারে না। এই কর্মফল ভোগ করার জন্যই মানুষকে জন্মজন্মান্তর জন্মচক্রের আবর্তে জন্মগ্রহণ করতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মার মোক্ষ লাভ হয়।

স্বাধীনতার প্রশ্নে বিবেকানন্দ বলেন, প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জনই মানুষের ঈপ্সিত লক্ষ্য। সে মুক্ত হলে প্রকৃতি তার বশীভূত হয়। বন্দিদশা থেকে আত্মার মুক্তি ও তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসেরই নাম জীবন। এই প্রয়াসে যদি সাফল্য আসে, তাহলে তাকে বলা হবে বিবর্তন। দাসত্বের বন্ধনমুক্ত পরবর্তী জীবন হচ্ছে মুক্তি, নির্বাণ বা মোক্ষ। সুতরাং 'প্রতিটি মানুষের পরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মের সঙ্গে একানুভূতি লাভ।'

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, জগৎ, জীবন এবং তার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তথা অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্মদর্শন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিবেকানন্দ নিজেকে নতুন ধরনের দর্শনের প্রবর্তকরূপেও প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও মধ্যযুগীয় দর্শনের মত বিবেকানন্দের দর্শনও ধর্মনির্ভর, তবুও জগৎ ব্যাখ্যায়, মায়ার স্বরূপ বিশেষণে তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় মেলে। জীব, জগৎ ও মায়া দর্শনের মাধ্যমে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বর্ণনা করে তিনি এ জগতে মানবজাতির মর্যাদাকে অনেক উচ্চে তুলে ধরেছেন। এজন্য জগতে মানবতাবাদীদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে গণ্য করা যায়।

সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন

সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তার অন্যান্য প্রত্যয়ের মত সমাজ ভাবনাও ছিল বৈদান্তিক আদর্শনিঃসৃত একটি সমন্বয়ী চিন্তা, যার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষ এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ছিল প্রেম। এ প্রেম ছিল বঞ্চিতের প্রতি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল হতে নিঃসরিত এক শর্তহীন ভালবাসা।

প্রত্যয় হিসেবে সমাজকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, প্রকৃতিজগতে যা কিছু আছে তা দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত, একটি হচ্ছে ব্যষ্টি, অন্যটি সমষ্টি। তাঁর মতে, প্রকৃতিতে এই ব্যষ্টি এবং সমষ্টির একটি নিবিড় ঐক্য বিদ্যমান। ঐক্যপন্থী বিবেকানন্দ ঐক্যের মাঝেই সমাজের প্রকৃতি খুঁজে পেতে চান। ব্যষ্টি এবং সমষ্টির প্রকৃতি বোঝাতে তিনি বলেন, 'The aggregate of many idividuals is called samashti and each individual is called vyashti (a part), You and I-- each is vyasti, society is samashti. You, I, an animal, a bird, a worm, an insect, a tree, a creeper, the earth, a planet, a star each is vashti,

স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতিক ছিলেন না, তবে ভারতমুক্তির প্রশ্নে তাঁর ছিল শক্তিশালী অবস্থান। তাঁর মতে, 'গণমানুষের মুক্তির জন্য প্রথমে প্রয়োজন ভারতের স্বাধীনতা। ভারত মুক্তির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাগ্রে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। স্বামীজী ইংরেজ শাসনকে ভারতের মুক্তির প্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন। কারণ তিনি ভারতে ব্রিটিশদের নির্মম শোষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

while this universe is samashti.' অর্থাৎ জগতে ক্ষুদ্র একক হল ব্যষ্টি, আর ব্যষ্টিরব ্যষ্টির, ক্ষুদ্রের-ক্ষুদ্রের যে সম্মিলিত ঐক্য বা হারমনি বিদ্যমান তাই হল সমষ্টি।

বিবেকানন্দের মতে, এককের সঙ্গে সমগ্রের যে ঐক্য বা মহামিলন গড়ে ওঠে তার পেছনে যে দর্শন রয়েছে তাই হল সমাজ গঠনের মূল দর্শন। আর তার ভিত্তি হল 'ভালবাসা এবং ত্যাগ'। সমাজ একটি ঐক্যবদ্ধ সমগ্র। আর এ সমগ্রের ভিত্তিমূলে আছে ইচ্ছার কল্পিত লিপ্সার বিসর্জন, ত্যাগ। অন্যপ্রান্তে আছে স্বশ্রেণি, স্বজাতির প্রতি ভালবাসা। বিবেকানন্দের মতে, সমাজ হল একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া এবং জীবন্ত সত্তার মতই বিবর্তনশীল। 'Society is the same as the Absolute, It is a divine creation, it is an aggregate of numerous individuals whose self sacrifice is required for its welfare.'

বিবেকানন্দ ইতিহাসকে বিচার করেছিলেন চারটি যুগের তাৎপর্যে। এ চারটি যুগ হল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যুগ। তাঁর মতে শোষণ চালাবার জন্য বিশ্বশাসকবর্গ স্থানকালপাত্র ভেদে চারটি হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়েছেন যথা জ্ঞানবুদ্ধি, সাহস-শৌর্য, অর্থনীতি (বণিক) ও গোষ্ঠীসংগঠন। পৃথিবীতে যে শ্রেণিশাসনের ইতিহাস রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, 'ইতিহাসের আদি অধ্যায় ছিল ব্রাহ্মণের শাসন, তারপর এলো ক্ষত্রিয় শাসন, আরো পরে বৈশ্য শাসন, এবার শূদ্রের বা কায়িক শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের শাসনের পালা।' স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা বিবর্তিত হচ্ছে ক্রমিক ধারায়, সে ধারার ধারাবাহিকতাতেই পৃথিবীতে শূদ্রের শাসন কায়েম হবে।

তিনি বলেন, 'জগতে এখন বৈশ্যাধিকারের (বণিক) তৃতীয় যুগ চলিতেছে, চতুর্থ যুগে শূদ্রাধিকার (প্রলেটারিয়েট) প্রতিষ্ঠিত হবে।' *বর্তমান ভারত* প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'এমন একদিন আসবে যখন পদদলিত শূদ্ররা জেগে উঠবে, সর্বত্র একাধিপত্য লাভ করবে, তখন কেউ আর তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে না।' স্বামী বিবেকানন্দ শূদ্র জাগরণকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কামনা করলেও কেবলমাত্র শূদ্র শক্তিকেই সমাজের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভাবেননি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র– এই চারটি শ্রেণির মধ্যে স্বামীজী দেখতে পেয়েছিলেন সামাজিক ক্রিয়াকলাপের চারটি মৌলিক শক্তি। নতুন পৃথিবীর আহ্বানে তিনি এই চারটি শ্রেণির কল্যাণকর দিকগুলোর সমন্বয়ের প্রত্যাশা করেছেন।

রাষ্ট্রদর্শন ও জাতীয়তাবোধ

রাষ্ট্রদর্শনে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা-চেতনার ভিত্তি হিসাবে তাঁর মানবতাবাদী চেতনাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তিনি নিজেকে 'সমাজতন্ত্রী' হিসেবে উলেখ করেন। স্বামীজী সারা ভারত ঘুরেছেন ব্যাপকভাবে, সাধারণের দুঃখক ষ্ট তিনি অনুভব করেছেন অন্তর দিয়ে। শ্রমিকশ্রেণির এই বঞ্চনার কারণ অন্বেষণে তিনি দেখতে পেয়েছেন শাসকদের শ্রেণিবৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও শোষণের নীতি। তাই তিনি কল্পনা করেছেন একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার। ভারত ভ্রমণের ফলে একটি বিষয় তাঁর উপলব্ধিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বঞ্চিত ভারতীয়দের পড়ো কথা বলার লোকের বড় অভাব। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'We have had lectures enough, societies enough, papers enough; where is the man who will lend us a hand to drag us out?' অর্থাৎ আমরা যথেষ্ট বক্তৃতা শুনেছি, অনেক সমিতি দেখেছি, ঢের কাগজ পড়েছি; এখন আমরা এমন লোক চাই, যিনি আমাদের হাত ধরে এই মহাপঙ্ক থেকে টেনে তুলতে পারেন। এমন লোক কোথায়? যিনি আমাদের প্রকৃতই ভালবাসেন? এমন লোক কোথায়? যিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন? ভারত পরিক্রমায় স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশের দরিদ্র মানুষের দুর্দশা দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে এমন উক্তি করেছিলেন।

রাষ্ট্রভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দ যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রদর্শনের সমর্থক ছিলেন এমন নয়। তিনি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করতে চান যেখানে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয় যুগের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ ক্ষমতা এবং শুদ্রের সাম্যবাদী আদর্শ বজায় থাকবে। অথচ তাদের দোষগুলো থাকবে না– সেটি হবে আদর্শ রাষ্ট্র।

স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতিক ছিলেন না, তবে ভারতমুক্তির প্রশ্নে তাঁর ছিল শক্তিশালী অবস্থান। তাঁর মতে, 'গণমানুষের মুক্তির জন্য প্রথমে প্রয়োজন ভারতের স্বাধীনতা। ভারত মুক্তির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাগ্রে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। স্বামীজী ইংরেজ শাসনকে ভারতের মুক্তির প্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন। কারণ, তিনি ভারতে ব্রিটিশদের নির্মম শোষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। *ইতিহাসের প্রতিশোধ* শীর্ষক আলোচনায় তিনি মন্তব্য করেন, যত জাতি ভারতে এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল এই ইংরেজ। ইতিহাস ইংরেজদের কৃতকার্যের প্রতিশোধ নেবেই। আমাদের গ্রামে, দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলা পা দিয়ে টিপে ধরেছে। আমাদের শেষ রক্তটুকু তারা নিজ তৃপ্তির জন্য পান করে নিয়েছে। আর আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান দিয়েছে।'

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন হলে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এর যথেষ্ট প্রমাণ মেলে তাঁর *বর্তমান ভারত* নামক গ্রন্থে। স্বামীজী তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অধ্যাপক কামাক্ষ্যা মিত্রকে বলেছিলেন, 'What India needs today is bomb'– তবে শুধু বোমা বা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশদের তাড়ানো যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন জনগণের সম্মিলিত জাগরণ।

ধর্ম-সমন্বয় চিন্তা

মানবসভ্যতার ইতিহাস বিচার করলে এর বিকাশে জ্ঞানবি জ্ঞানের যতখানি প্রভাব দেখা যায়, ধর্মের প্রভাব তার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। ধর্ম মানুষের পবিত্রতম অনুভূতির নাম। এটিই মানুষের জীবনকে ইহজগতে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নানা অর্থে, নানা পরিপ্রেক্ষিতে। মানবজীবনে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে ইংল্যান্ডে এক বক্তৃতায় মানব সভ্যতার বিকাশে কত কল্যাণকর আর কত অকল্যাণকর কর্ম হয়েছে তার উলেখ করে বিবেকানন্দ বলেন, 'মানুষ সর্বোত্তম প্রেমের আশ্বাস পেয়েছে ধর্ম হতে; উৎকৃষ্ট শান্তির বাণীসমূহ শুনেছে ধর্মরাজ্যের লোকদের মুখ হতে; বেশিরভাগ সেবামূলক কাজসমূহ সম্পন্ন হয়েছে ধর্মের প্রেরণায়; ধর্মের প্রভাবে মানুষ যতটা কোমলস্বভাব লাভ করেছে আর কিছুতে হয়নি। পক্ষান্তরে মানুষ যত প্রকার পৈশাচিকতা ও ঘৃণার

শিকার হয়েছে তার উদ্ভব ঘটেছে ধর্ম হতে। যুগে যুগে মানুষ তীব্রতম নিন্দার অভিশাপ ও ভয়ের বাণী শুনেছে ধর্মের লোকদের মুখ হতে। ধর্মপ্রেরণায় মানুষ পৃথিবীতে যত হানাহানি ঘটিয়েছে তা আর কোন উৎসের প্রেরণায় সম্ভব হয়নি। ধর্মের প্রভাবে মানুষ যতটা নিষ্ঠুর হয়েছে তা আর কিছুতেই হয়নি।'

বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম কেবলমাত্র মানুষের বিশ্বাস ও মৌলিক অনুভূতিই নয়; বরং তার ব্যাপক সামাজিক ও ব্যবহারিক তাৎপর্যও বিদ্যমান। শুদ্ধতম ধর্মানুভূতিসম্পন্ন মানুষ সমাজের চালিকাশক্তি। এরা সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে দৃঢ় করে; আর দশজনের হিত সাধন করে, সমাজকে চালিত করে প্রগতির দিকে। পৃথিবীতে ধর্ম তো একটি নয়, অনেকগুলো। এই ধর্মসমূহ হয়তবা বাস্তবিক পরিপ্রেক্ষিতে কোনটিই অন্যটির তুলনায় খাটো নয়, হীন নয়। তবুও কোন এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা আন্তঃধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অস্তিত্বশীল। আর এই হীন প্রতিযোগিতাই তৈরি করে সংকট; যা বিকৃত ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন উন্মাদনা ও উন্মত্ততাকে উস্কে দেয়; রচনা করে সংঘাতমূলক পরিবেশ; রচনা করে রক্তাক্ত ইতিহাস। বিবেকানন্দ চেয়েছেন সকল ধর্মই যেন এই অযৌক্তিক অন্ধ প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থেকে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির মাধ্যমে বিশ্বমানব কল্যাণে এগিয়ে আসে।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ শেষে তিনি বলেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামিগুলোর ভয়াবহ ফলস্বরূপ, ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করে রেখেছে। এরা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করেছে। বারবার এটিকে নরশোণিতে সিক্ত করেছে। সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং জাতিসমূহকে হতাশায় মগ্ন করেছে। এ ভীষণ পিশাচগুলো যদি না থাকত, তা হলে মানব সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হত। তবে এর মৃত্যুকাল উপস্থিত এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এ ধর্ম মহাসমিতির সম্মানার্থে, আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হয়েছে, তাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।' শিকাগো সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্বোধনী ভাষণে উপরোক্ত আশাবাদ ব্যক্তের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিদ্যমান। উগ্রজাতীয়তাবাদ, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ মিলিয়ে সে সময়ের ইউরোপ সারা বিশ্বের মানবতাবাদ বিকাশের জন্য ব্যাপক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

অপরদিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিকতার আবহে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণ ও শাসন সাধারণ মানুষের জীবনকে চরম বঞ্চনার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। অর্থাৎ বিবেকানন্দের সময়কালে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির স্থলে সংঘাত ও শোষণের বাস্তবতাই ছিল প্রকট। এ ধরনের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯৩র ১১ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাষণটি দিয়েছিলেন ব্যাপকতায় তা ছিল মাত্র তিন মিনিটকাল স্থায়ী। সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পকালীন এই বক্তব্য প্রায়োগিকতার প্রেক্ষিতে ও তাৎপর্যে ছিল উৎকর্ষতর। এ ভাষণের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল, ''সর্বকালের সর্বমানবের সর্বাপেক্ষা বঞ্চিতের বক্তব্য' আমরা কেবলমাত্র বিশ্বজনীন সহনশীলতাতেই বিশ্বাস করি না, আমরা সব ধর্মকেই সত্য বলে গ্রহণ করি।'

ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির একটি ব্যাখ্যা স্বামীজী শিকাগো বক্তৃতায় গল্পের মত তুলে ধরার প্রয়াস পান। গল্পটি এমন 'কোন একটি ক্ষুদ্র কুপে এক ভেক বাস করত। দৈবক্রমে সমুদ্রতীরবাসী একটি ভেক এসে সেই কূপে পতিত হল। প্রথম ভেকটি যখন শুনল যে দ্বিতীয়টি সমুদ্র হতে এসেছে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, সমুদ্র! সে কত বড়? তা কি আমার কূপের মত বড়? সে যত বলে যে ক্ষুদ্র কূপের সহিত সমুদ্রের কোন তুলনাই হতে পারে না ততই কূপমণ্ডুক তার প্রতিবাদ করল। অবশেষে বলল, আমার কূপের ন্যায় কিছুই বড় হতে পারে না, এটি অপেক্ষা কিছুই বড় থাকতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, অতএব এটিকে তাড়িয়ে দাও।'

এ আখ্যানটির উলেখ করে স্বামীজী বলেন, 'হে ভ্রাতৃগণ, এরূপ সংকীর্ণভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান– আমরা সকলেই নিজের নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি ও এটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছি। আশা করি এই ধর্ম মহাসভার ফলে এই ক্ষুদ্র জগৎগুলোর অবরোধ ভাঙ্গিয়া যাইবে।'

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের মানুষ ছিলেন। ধর্ম পথেই তিনি সাধারণ মানুষকে কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে আনার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁর ধর্মমত ছিল গতানুগতিকতা বর্জিত। তাঁর ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি মূলে ছিল জীবপ্রেম এবং অবশ্যই তা ছিল জ্ঞানবি জ্ঞান এবং দার্শনিক বিচারে আলোকিত ও প্রজ্ঞাময়। স্বামী বিবেকানন্দের অনুভূতিতে হিন্দু ধর্ম যে অন্য ধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এমন ইঙ্গিত আমরা কখনোই দেখতে পাই না। তিনি ছিলেন এমন এক ধার্মিক যিনি সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তব্যের এই অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য। 'যে ধর্ম চিরদিন সকল ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছে আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে অন্যধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখি কেবল তাহা নহে; আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়া মনে করি। যে ধর্মের অভিধানে 'বর্জন' বা পরিত্যাজ্য শব্দ নাই আমি সেই ধর্মভুক্ত।'

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বিশাল অংশ পরিভ্রমণ করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীর রচনা, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য এবং ভারত ইতিহাস বিশেষণ করে দেখতে পান যে, ভারতে তাঁর পূর্বপুরুষগণের সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের শত বছরের যুক্তিনির্ভর সংস্কার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। তখনি তিনি ফিরে গেলেন ভারতীয়দের প্রাচীন পন্থা, ধর্ম পথে। তিনি দেখতে পেলেন ধর্মের মাধ্যমেই মানুষকে পরিশুদ্ধ করা সম্ভব। আর এরই লক্ষ্যে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে, যেখানে অন্যধর্মের লোকেরা নিজেদের ধর্মের স্তুতি বর্ণনে ব্যস্ত, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মহান বাণী 'যত মত তত পথ'– বিশ্বের সকল ধর্মের অনুগামীদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন।

শিকাগোর ধর্ম মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রসঙ্গে এর শেষ অধিবেশনে তিনি বলেন, 'যদি এখানে কেহ এরূপ আশা করেন যে, উক্ত সমন্বয় বিভিন্ন ধর্মসমূহের মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ দ্বারা সাধিত হইবে, তবে তাহাকে আমি বলি, ভ্রাতঃ তোমার আশা ফলবতী হওয়া অসম্ভব। আমি ইচ্ছা করি না যে, খ্রিষ্টান হিন্দু হউন অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রিষ্টান/মুসলিম হউন। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মগুলোর সারভাগগুলিকে ভিতরে গ্রহণ দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্ধিত হইবে। পবিত্রতা, উদারতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদগুণসমূহ কোন ধর্মেরই নিজস্ব নহে এবং প্রত্যেক ধর্মেই উন্নত চরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে। শীঘ্রই দেখিবেন... সকল ধর্মের পতাকাশীর্ষে লিখিতে হইবে, সমর নহে– সহায়তা, বিনাশ নহে– বরণ! দ্বন্দ্ব নহে– মিলন ও শান্তি।'

জীবনাদর্শ মূল্যায়ন

প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে নিজস্ব আদর্শ, পথ চলার নিজস্ব পন্থা, আছে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। কারণ মানুষই পৃথিবীতে একমাত্র মননশীল প্রাণী। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বা মানদণ্ডে আমরা জানি যে প্রতিটি মানুষই কমবেশি দার্শনিক। কারণ প্রত্যেকেরই নিজের মত করে ভাবনা আছে, আছে নিজস্ব জীবনাদর্শ। কিন্তু মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা কিছু কিছু মনীষীর নাম পাব যাদের নিজস্ব জীবনাদর্শ, মননশীলতা, যুক্তিবাদিতা কেবল নিজের জীবনকেই আলোকিত করেনি বরং আলোকিত ও বিকশিত করেছে সমগ্র মানবজাতিকে। এঁদেরই একজন হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসম্পন্ন, জীবন

ঘনিষ্ঠ এই মহামানবের জীবনাদর্শ ছিল মানবকল্যাণ বা মানবতাবাদ। আর এই আদর্শ বাস্তবায়নে তিনি বেছে নিয়েছেন 'প্রেম'কে। প্রেমের মাধ্যমেই তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন সামাজিক সম্প্রীতিবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ।

ব্যক্তিগত জীবনে বিবেকানন্দ ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি গোটা ভারতসহ- বিশ্ব ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও প্রভূত জ্ঞানলাভ করেছেন। তিনি চিন্তায় ও কর্মে ছিলেন স্বাধীন, বুদ্ধিতে সৃষ্টিশীল এবং প্রচ- প্রতাপশালী। মানুষকে তিনি বশীভূত করতেন অক্লেশে। এ হেন চারিত্রিক গুণাবলি ও মেধার অধিকারী হয়েও নরেন্দ্রনাথ যখন জীবনযুদ্ধে একজন পরাজিত সৈনিক হিসেবে আবির্ভূত হন তখন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন দারিদ্র্যের স্বরূপ, ক্ষুধার কষ্ট। এ থেকে তিনি লাভ করেন জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

অন্যদিকে জ্ঞানগত দিক থেকে বিবেকানন্দের মনন বিকাশের ধারা বিকশিত হয় সংশয়বাদের মধ্য দিয়ে। হেগেলীয় ভাববাদ, পাশ্চাত্যের জ্ঞানবি জ্ঞান, দর্শন এবং তাঁর সমকালীন ভারতীয় সংস্কারকদের যুক্তিবাদিতা নরেন্দ্রের সংশয়বাদী মনকে কিছুতেই তৃপ্ত করতে পারেনি। তিনি চেয়েছিলেন একটি নিষ্পত্তি- যা তিনি অবশেষে লাভ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিড়্গা থেকে, সংস্পর্শ থেকে। হৃদয়কেন্দ্রিক বিবেকানন্দের জীবন তাঁর হৃদয়ের পরিতৃপ্তি খুঁজে মানবসেবায়, সন্ন্যাসজীবনের মধ্যে।

সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের মাধ্যমে বিবেকানন্দ সংসারধর্মকে ত্যাগ করেননি, সংসার থেকে পালিয়ে যাননি। ভ্রাতা, মাতা, ভগ্নি সকলের জন্যই তিনি ভাবতেন, তাঁদের জন্য টাকা পাঠাতেন। এতে একদিকে যেমন তাঁর পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রমাণ মেলে অন্যদিকে তিনি বরাহনগরে 'আশ্রয়হীন ও সম্পদশূন্য' সন্ন্যাসীদের ভরণ-পোষণে ব্রতী হন। এতে নিরন্ন ও আশ্রয়হীন জনগণের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ ও দয়ার, প্রেমের ও ভালবাসার পরিচয় মেলে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন চূড়ান্ত অর্থে মানবতাবাদী রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর শিকাগো সম্মেলনে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তার তাৎপর্য তুলে ধরার মাধ্যমে এবং ধর্মের আবহে তাঁর মানবতাবাদী চিন্তা কার্যে পরিণত করার মাধ্যমে। বিশ্বের বেশিরভাগ চিন্তাবিদের মত শুধুমাত্র তত্ত্বকথায়, উপদেশ দিয়ে মানবকল্যাণে বিবেকানন্দ বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা তাঁর কর্মে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। সফল কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমেই তিনি মানবসেবা করতে চান।

ভারত পরিভ্রমণকালে নানা স্থানে ঘুরে দরিদ্র থেকে শুরু করে রাজামহারাজা দের সঙ্গে মিশে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্রের সংস্পর্শে এসে, তিনি ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশা উপলব্ধি করেছেন, অনুভব করেছেন নীচএর, অ স্পৃশ্যর, মেথর, চামার আর মুচির মর্মবেদনা। আর এতেই চূড়ান্ত পরিচয় মেলে বিবেকানন্দের মানবতাবাদের; যখন তিনি বলেন, 'কে অস্পৃশ্য- এরা নারায়ণ। হোক না দরিদ্র, কি আসে যায়? এরা যদি আলো না পায়, এদের যদি জাগানো না হয়, এদের যদি আপনজন বলে পাশে স্থান না দেওয়া হয় তাহলে দেশ কোন দিন জাগবে না'।

বঞ্চিতের প্রতি বিবেকানন্দের মর্মবেদনার এবং সহানুভূতির পরিচয় মেলে তাঁর অনেক বাণীতে, যেমন- 'আহা দেশের গরীব-দুঃখীদের জন্য কেহই ভাবে নারে। যারা জাতির মেরুদণ্ড- যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে। যে মেথরমু দ্দাফরাস একদিন কাজ না করলে শহরে হাহাকার উঠে যায়; তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখদুঃ খে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই? আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি- ছুঁস্নে, ছুঁস্নে। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছেরে বাপ?'

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেড়্গিতে দেখা যায় যে, বিবেকানন্দ বাঙালি দার্শনিকদের মধ্যে একজন অন্যতম সেরা মানবদরদী। মানুষের জয়গান গেয়েছেন তিনি ধর্মের আবহে। কিন্তু জীবনের সকল প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন তিনি দর্শন থেকে, যা ছিল পরম ঐক্য, এক কথায়, অদ্বৈতবাদে।

মানুষকে এই ঐক্যের বোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই তিনি কাজ করে গেছেন আজীবন। তাঁর জীবনদর্শন ছিল পৃথিবীর সকল মানুষের, সকল সমাজের, সকল শ্রেণির সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। যার ফলে মানুষ হয়ে উঠবে যথার্থ মানুষ, আলোকিত মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ।

মোহাম্মদ দিদারুল আলম বীর প্রতীক প্রাবন্ধিক

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি আবেদন

ভারত বিচিত্রার পক্ষ থেকে ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি (Association of Bangladesh Students Studied in India- ABSSI)র সদস্যসহ ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশী প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য রচনা ও মতামত পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এখন থেকে *ভারত বিচিত্রার* এক পৃষ্ঠায় এইসব লেখা নিয়মিতভাবে ছাপা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে *ভারত বিচিত্রা* আইসিসিআরবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রসহ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ রচনা করতে আগ্রহী যাতে এবিএসএসআইএর কর্মকা- এবং ভারতে তাঁদের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ জনসমক্ষে প্রচারিত হয়। এভাবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান উষ্ণ সম্পর্কে তাঁরা আরো গতিবেগ সঞ্চার করতে পারবেন বলে আমাদের ধারণা।

মাসের প্রথম সপ্তাহে *ভারত বিচিত্রার* ঠিকানায় প্রাপ্ত লেখা পরবর্তী মাসে ছাপার জন্য বিবেচিত হবে।

পুরনো পাতা

মধুবনী পেইন্টিং

কৃষ্ণা চৈতন্য

প্রথম শতাব্দীতে রোমের এ্যারিস্টোক্রাট পিস্সনি তাঁর সময়কার নাগরিকদের বেহিসেবীপনার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল রোমের নাগরিকরা সিল্ক, মসলিন, ছাপা সূতি কাপড় এবং অন্যান্য সুন্দর জিনিস ভারত থেকে আমদানি করে এবং এজন্যে রোমের প্রচুর অর্থ ভারতে চলে যায়। সাধারণভাবে শহরবাসী পিনি সম্ভবত খুব একটা যুক্তিসঙ্গত কথা বলেননি। কেন-না এই আমদানির বিষয়টা এক তরফা ব্যাপার ছিল না। রোমের পণ্যদ্রব্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভারতে আসত।

পৌরাণিক কাহিনিতে প্রাচীন ভারতের হস্তশিল্পজাত পণ্যের কথা গৌরবের সঙ্গে উলেখিত হয়েছে। রামায়ণে আমরা পড়ি যে, রামের সন্ধানে ভরতের সঙ্গে যাঁরা বনে গমন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণকার, তন্তুবায়, মণিকার, হাতির দাঁতের কর্মকার এবং মুদ্রাকর। শ্রীরামের জীবনসঙ্গিনী সীতার বাড়ি বিহারের দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের মিথিলায়। এই অঞ্চলের মধুবনী পেইন্টিং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সমাদর লাভ করেছে। অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস বোর্ড মধুবনী গ্রামে একটি বিক্রয় ও নির্মাণ কেন্দ্র উদ্বোধন করে এই হস্তশিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। এই কেন্দ্রে বর্তমানে পনেরশো মহিলা পেইন্টিং পণ্য উৎপাদন করে। হ্যান্ডিক্রাফটস্ এন্ড হ্যান্ডলুম এক্সপোর্ট কর্পোরেশন এই সব পণ্যের জন্য বিদেশী বাজার অন্বেষণ ও সৃষ্টি করেছে। কানাডা এবং পোল্যান্ডের মত অনেক দেশ বর্তমানে এই পণ্য আমদানি করছে।

ভারতের এক নিভৃত পলিঅঞ্চলের মহিলাদের তৈরি এই পেইন্টিং পাশ্চাত্যের দেশসমূহের কাছে তুলে ধরার ও আকর্ষণ সৃষ্টির মূলে অবদান রয়েছে একজন ফরাসী তরুণের। জর্জেস লুনেউ নামের ঐ তরুণ ঐ এলাকায় বসবাস করেন। তিনি সেখানকার ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে একটি সুন্দর চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই চলচ্চিত্রটি দীর্ঘদিন যাবৎ পাশ্চাত্য দেশগুলোতে প্রদর্শিত হয়। মধুবনী পেইন্টিংয়ে চিত্রিত কাহিনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রেখে জর্জেস লুনেউ পলির

অভিনেতাদের দিয়ে রামায়ণের কাহিনি অভিনয় করিয়ে দেখিয়েছেন যে, এখনও পৌরাণিক কাহিনির কী বিপুল উদ্দীপনামূলক শক্তি রয়েছে। মধুবনী পেইন্টিংয়ে চিত্রিত ভাল বিয়ের আশায় অনূঢ়া তরুণীদের উদ্‌যাপিত গৌরীব্রত এবং বিয়ের দৃশ্যাবলী লুনেউ সুন্দরভাবে তাঁর ছবিতে পরিস্ফুটিত করে তোলেন।

মধুবনী পেইন্টিং যদিও এখন বিশ্বের সর্বত্র সুপরিচিত, তবু ভুলে গেলে চলবে না, যে মূল ঐতিহ্য থেকে এর উৎপত্তি তা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। উৎসবের দিনে ঘরের মেঝে এবং দেয়াল লোকশিল্পের মাধ্যমে অলঙ্কৃত করার কাজ স্মরণাতীতকাল থেকে চলে আসছে। বাংলায় এটি আলপনা, উত্তর প্রদেশে আরিপনা, রাজস্থানে মন্ডানা, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে রঙ্গোলি এবং দক্ষিণ ভারতে কোলাম নামে পরিচিত। প্রত্যেক অঞ্চলেই এই শিল্প তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উন্নতি লাভ করেছে। তরাই অঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত এবং দক্ষিণ বিহার থেকে গঙ্গা ও গণ্ডক নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বারভাঙ্গা একটি বিশেষ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে লালিত। এর ফলেই মধুবনী পেইন্টিংয়ের মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছে।

বসতঘরের কয়েকটি বিশেষ স্থানে পেইন্টিংয়ের কাজ করা হয়: পূজার জন্য বাইরের বারান্দা যেখানে অতিথিঅভ্যাগতরা বসেন এবং শোবার ঘর বা যেখানে ঘুমানো হয়। মহাকাব্য ছাড়াও ভারতের পৌরাণিক কাহিনি থেকেও চিত্রাঙ্কনের বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয়। লক্ষ্মী হচ্ছেন সমৃদ্ধির দেবী। লক্ষ্মীর পায়ের পাতা ঘরমুখী করে দরজায় লক্ষ্মীর পা আঁকা হয়। এর অর্থ হচ্ছে গৃহে লক্ষ্মী আসবেন।

রঙের সমৃদ্ধি

প্রথমে মধুবনী পেইন্টিং অঙ্কিত হত ঘরের মেঝে এবং দেয়ালে। সেখান থেকে এটি আঁকা হয় কাপড়ে এবং পরে কাগজে। সব রঙই স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত। যৌবনের প্রতীকধর্মী লাল রঙ প্রায়শই চিত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই রঙ সংগ্রহ করা হয় বুনোঘাসের মধ্যে প্রস্ফুটিত কুসুম ফুল থেকে। কলাপাতার রস, দুধ এবং লেবু থেকে হালকা সোনালি রঙ তৈরি করা হয় এবং হলুদ থেকে আসে উজ্জ্বল পিঙ্গল রঙ। কাঠকয়লা জ্বালিয়ে সেই ধোঁয়াকে ধরে রেখে গাঢ় কালো রঙ তৈরি করা হয়। পলাশ ফুল থেকে হলুদ এবং লতাপাতা থেকে সবুজ রঙ তৈরি হয়। রঙকে আঠালো করার জন্য অর্থাৎ ধরে রাখার জন্য বাবুল গাছের আঠার সঙ্গে ছাগলের দুধ মিশিয়ে একটি মাধ্যম তৈরি করা হয়। সীমারেখা এবং সূক্ষ্ম নক্সা করার কাজে বাঁশের ছোট কঞ্চি ব্যবহার করা হয়। এর এক মাথাকে ব্রাশের রূপ দেওয়া হয়। স্থূল দাগ দেওয়ার জন্য কঞ্চির মাথায় ছোট কাপড় বেঁধে নেওয়া হয়। শিল্পীরা সবাই মহিলা।

বৌদ্ধ আমলের দেয়ালের পেইন্টিং যখন পাল আমলে তালপাতার পাণ্ডুলিপিতে নেমে আসে, সেই প্রাথমিক পর্যায়ে চিত্রশিল্পের অবস্থা ছিল অপরিপক্ব ও কাঁচা। কিছুকাল পরে অঙ্কনে রেখার সংখ্যা হ্রাস পায় এবং বহু আঁচড়ের পরিবর্তে এক আঁচড়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। মধুবনীর ক্ষেত্রে এই ধরনের অসুবিধার উদ্ভব হয়নি, কেননা কাগজে অঙ্কিত হওয়ায় কমবেশি এই পেইন্টিং মুর‍্যালের আকার বজায় রাখে। কাজেই এ শিল্প হয়ে ওঠে ব্যাপক ও সমৃদ্ধিশালী।

তবে রঙের মধ্যে জমকালো তেমন কিছু নেই। গাছগাছড়ার রস থেকে দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি এই রঙের ঔজ্জ্বল্য আছে, আছে সজীবতা। গ্রাউন্ড কালারে ব্যবহৃত হয় গৈরিক মাটি ও মেরুন রঙের মধ্যবর্তী একটি রঙ। এই রঙ আহরিত হয় কুসুম ফুল থেকে। এটা সত্য যে, এই রঙের আকর্ষণ ও আবেদনের সঙ্গে কোন শিল্পজাত রঙ পাল্লা দিতে পারে না। দূর থেকে দেখলে দেখা যায়, সমগ্র ছবির উজ্জ্বল রঙগুলো এক অপূর্ব ঐক্যের মধ্য দিয়ে সমন্বিত হয়েছে।

যেসব মহিলা শিল্পী নকশা করেন তাঁরা পরিমিতিবোধ, রঙের ব্যবহারকুশলতা প্রভৃতি ঐতিহ্যগতভাবে পেয়ে থাকেন। গাছের পাতা এবং ফুল সূক্ষ্মভাবে দক্ষহাতে সুন্দরভাবে আঁকা হয়। কোনরকম যন্ত্রপাতি ছাড়াই যেভাবে অনায়াসে আলপনা বা কোলামের জ্যামিতিক নকশা আঁকা হয়, সেভাবেই পাতা ও ফুল আঁকা হয়। প্রথম দর্শনে একই ধরনের একটি চারপাপড়ির ফুল অঙ্কনের মধ্যেও আশ্চর্য বৈচিত্র্য চোখে পড়ে।

গঠনআকৃতি সর্বজনীন হলেও ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে ভিন্নতা আসে। ঐতিহাসিক সময় অভিন্ন কাজের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে থাকলেও ঐক্য নজরে আসে। মধুবনী পেইন্টিংয়ের মানুষের উন্নতনাসা, ক্ষুদ্র কপাল, ডাগর চোখ এবং দীর্ঘ হাতপায়ের সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে ইজিয়েন অঞ্চলের ক্রিটের প্রাচীন অঙ্কনশৈলীর। এই সভ্যতা গ্রিক সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মিথিলার কিষাণবধূদের সৃজনশীল বুদ্ধি এমন একটি শিল্পধারার সৃষ্টি করেছে, যার আবেদন সর্বযুগে থাকবে। এ কারণেই মধুবনী পেইন্টিং স্মরণ করিয়ে দেয় ক্রিট সভ্যতার অঙ্কনশিল্পের কথা। মধুবনী পেইন্টিং দিয়ে ইন্ডিয়া ট্যুরিজম পরিচালিত নয়াদিল্লির আকবর হোটেল অলঙ্কৃত করা হয়েছে।

ভারত বিচিত্রা, জানুয়ারি ১৯৮৩

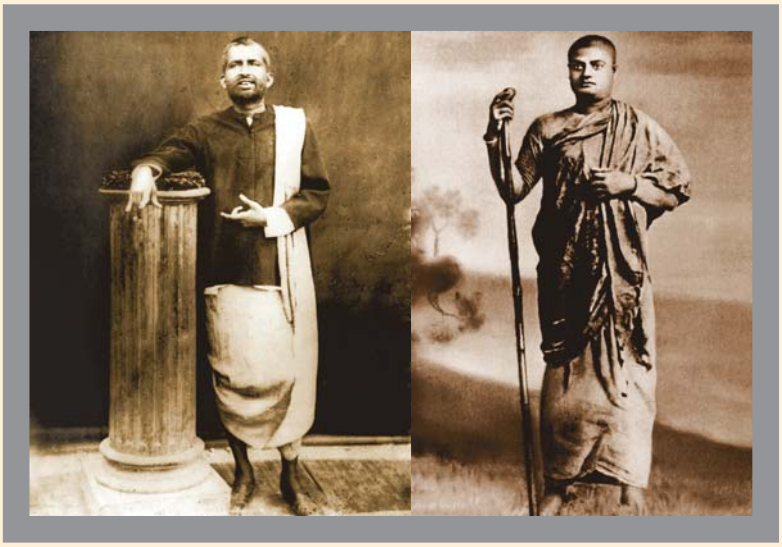

নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

গুরু-শিষ্যের সরস প্রকাশ

ড. মারুফী খান

বড় মানুষের কথা লিখতে গেলে, কেমন যেন এক ধরনের গাম্ভীর্য এসে পড়ে। কিন্তু সহজ কথাটি সহজ করে বলতে পারার মধ্যে যে আরাম বা স্বস্তি আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যুগে যুগে, শতকে শতকে মহামানবেরা পৃথিবীতে আসেন, তাঁদের কিছু কাজ থাকে অথবা কাজ করে যেতে হয়, মূলত জীবনকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাকে তাঁরা মূল্য দেন এমন এক মাত্রায় যেখানে 'সবই আছে আবার কিছু নেই'ও বটে। এ বড় জটিল ধাঁধা। কিন্তু সমাধান যদি সরল ভাষায় পেতে হয় তবে গভীর থেকে গভীরে যেতে হয়। বিরাট হিমালয়ের মধ্যে সহস্র জলধারার প্রস্রবণ লুকিয়ে আছে, বসন্তু শেষে কত রঙ্গীন ফুলের সমারোহ আছে তা কি হিমালয় পরিভ্রমণ ছাড়া জানা যায়? যায় না! তাই যাঁরা পৃথিবীতে এলেন ধর্মের কথা শোনাতে কিংবা বিজ্ঞানের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করতে, তাঁদের জীবনযাপনের ইতিহাসে কঠিন বাক্য, দুরূহ দর্শন যেমন থেকেছে, তেমনি নানা দুর্ভোগ দুর্বিপাকেও সদা হাস্য-রসিকতায় তাঁরা প্রিয়জনদের মন দিয়েছেন অকৃত্রিম মধুরসে ভরিয়ে।

এতকিছু লেখার একটাই উদ্দেশ্য– ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ কি কেবল গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা বলতেই জগতে এলেন, নাকি যারা তাঁদের সম্বন্ধে তত্ত্ব-তালাশ করতে চাইলেন জানলেন, টমাস গ্রে-র কবিতার পঙ্‌ক্তির মত কত দামী মণিমুক্তা গভীর সমুদ্র তলদেশে আলো বিকিরণ করে, কত নামহীন ফুল মরুর বাতাসকে সুবাসিত করে, কে তার খবর রাখে?

ধর্মবেত্তারা সবাই কি শুধু শক্ত শক্ত কথাই মানুষের জন্য বললেন? আর মানুষ সে-সব গম্ভীর কথা বুঝতে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে শিখতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো নিজের মুখের হাসিটুকুও উধাও করে ফেলল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল ঠাকুর রামকৃষ্ণ জীবনকে কি সহজ করে যে বুঝিয়ে দিলেন– গৃহী, ত্যাগী সবাইকে, যে মনেই হল না তিনি ঈশ্বরচিন্তার সুফলটির আবরণ কত সহজ এবং সরসভাবে ঢুকিয়ে দিলেন অন্তরে। 'তুই দয়া করার কে রে শালা?' কথায় বিশেষ শব্দটি নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, শালীন অশালীন এসব ডিঙিয়ে একটা সহজ প্রবাহ মন ছুঁয়ে যায়– তুই জগতে জীবে দয়া নয়, প্রেম করবি। এ শব্দ গ্রাম গঞ্জের সাধারণ পরিহাস হলেও কেমন যেন খাপে খাপে মিলে গেল। লিখিত হল স্বামী বিবেকানন্দের অমর কবিতার শেষ চরণটি– 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

তা এমন ঠাকুরের শিষ্য বিবেকানন্দ। কলকাতা শহরে জন্ম, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। যথার্থ শিক্ষিত এবং জ্ঞানী হবার জন্যই বোধহয় জন্মেছিলেন। গুরুর শিষ্য 'নরেন' অবলীলায় যখন 'লরেন' হয় তখন মনে মনে এক সূক্ষ্ম রস জন্ম নিতে শুরু করে। তুমি আপনি মিলিয়ে কথার মধ্যে যে মাধুর্য– তা আমাদের শহুরে শিক্ষিত সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, বললে ভুল হবে। একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে গিয়ে এই ভাষাকে তুচ্ছ করার স্পর্ধা অন্তত ঠাকুর স্বামীজী ভক্তকুলে ভাবনা জাগায় না, বরং সরল কৌতুকে ধর্মচিন্তার দর্শনবাক্যের অন্তরালে যে এদের মধ্যে এক চিরশিশু বিরাজ করেছে তা ভাবলেই নদীর বুকে মৃদু তরঙ্গের মত কম্পন মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'স্মিতহাস্যরস'এর কথা। হাসিরও পরিমাপ আছে। হাসির এটম বোম আর ঠোঁটের কোণে চকিতে পাওয়া হাসির ঝলক এক হতেই পারে না।

ঠাকুরের ঈশ্বরচিন্তায় ঘোর সন্দেহপ্রবণ নরেন্দ্রনাথের সময় লেগেছে বৈকি ঠাকুরচরিত্র অনুধাবন করতে। কিন্তু সুরসিক, মাটির কাছাকাছি রামকৃষ্ণ পরমহংস অমৃতলোকের স্পর্শ দিয়েছেন কত সহজ ভাষায়, সরল উক্তিতে। নরেন্দ্র সেপ থে হেঁটেছেন নিজেও। রঙ্গরসিকতায় ভুলেছেন নিজের ঊনচলিশ বছরের রোগাক্রান্ত দেহের যন্ত্রণা। আর রামকৃষ্ণ ভুলিয়েছেন ৫০ বছরের ক্লিষ্ট দেহের দাহ!

একবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'মনুষ্য জীবনের কর্তব্য কী?' বঙ্কিম বললেন– 'আহার নিদ্রা আর মৈথুন।' ঠাকুর বড়ই আহত এবং ব্যথিত হলেন। ছিঃ ছিঃ করলেন। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই 'আপনি কিছু মনে করনি তো' জাতীয় মিশ্রশব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কথা বললেন। ঋষি বঙ্কিমের বন্ধু বললেন, 'চলুন যাই।' বঙ্কিম নড়লেন না। এক সময় নম্রতায় প্রার্থনা জানালেন রামকৃষ্ণের কাছে 'আমার ওখানে (বাড়িতে) যাবেন কি মহাশয়? ওখানে অনেক ভক্ত আছে।' 'কেমন ভক্ত?' বলে ঠাকুর সহাস্যে এক গল্প ফাঁদলেন। একটি স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত, পরম বৈষ্ণব– গলায় মালা, কপালে তিলক, হাতে হরি নামের মালা। সকলে বিশ্বাস করে ঐ দোকানেই আসে, ভাবে এ পরম ভক্ত, কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খদ্দের এলে দেখত কোন কারিগর বলছে, 'কেশব! কেশব!' আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম করছে, 'গোপাল! গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর বলছে, 'হরি! হরি', তারপর কেউ বলছে 'হর! হর!' কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দারেরা সহজেই মনে করত, এ স্যাকরা অতি উত্তম লোক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে বললে, 'কেশব কেশব' তার মনের ভাব এ সব (খদ্দের) কে? যে বললে 'গোপাল গোপাল' তার অর্থ এই যে আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল। (হাস্য) যে বললে 'হরি হরি'– তার অর্থ এই যে, যদি গরুর পাল, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। (হাস্য) যে বললে 'হর হর'– তার মানে এই– তবে হরণ কর, হরণ কর; এরা তো গরন্নর পাল! (হাস্য)

ভাবতে হয় মনুষ্যচরিত্রের বহুমাত্রিকতা রামকৃষ্ণ কি গল্পচ্ছলে ব্যাখ্যা দিলেন যে রসের পুলক বয়ে গেল শিহরণ জাগিয়ে। বিবেকানন্দ পূর্ব পশ্চিমের দেশবি দেশ ঘুরে ঘুরে কতই না লোকের সংস্পর্শে এলেন, দেখলেন এবং চিঠির মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে তা তুলে দিয়ে গেলেন ভাবীকালের জন্য, আমাদের এবং পরবর্তী সময়ের জন্য।

নরেন্দ্র গুরুভাইদের কাছে আদৃত ছিলেন অবশ্যই, হাস্যপরিহা সে বরাহনগরের সংঘের মহাবিপদেও কৌপীন পরে, (অনেক সময় বেরুবার সময় একটা কৌপীনই সম্বল বিধায় ভাগ করে তা পরে বেরুতে হতে) জীবনের যন্ত্রণাকে কঠিন করেননি। বরং কোন পাতায় খাওয়া চলে সে কচু পাতা না লাউ পাতা, কলা পাতা না অন্য কোন পাতা, গলা চুলকোয় তো তাতে কি? একখানা কাপড়ে গরম ভাত ঢেলে লঙ্কা লবণের ঝোল' মেখে খাওয়ার বিবরণে চোখে জল এলেও সময়কে এমন বিদ্রূপ করার মধ্যে এক ধরনের মজা কিন্তু অনুভূত হয়। এই মজাই সম্ভবত রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ (শ্রী শ্রী মা সারদাও বাদ যান কেন?) আমাদের মনের সুরযন্ত্রটি অনায়াসে বাজিয়ে দিতে পেরেছেন। সাধুদের শরীর- স্বাস্থ্য রুগ্ন না হয়ে স্থূলকায় হওয়ার পিছনে সরস উক্তি, 'এটাই আমার ফেমিন ইনসিওরেন্স ফান্ড– যদি পাঁচদিন খেতে না পাই তবু আমার চর্বি আমাকে জীবিত রাখবে।'

বিলেতে স্বামীজী সজাগ সব বিষয়ে। পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ দৃষ্টি তাঁর রহস্যভেদ করেছে পাশ্চাত্য রীতিনীতি। স্বামী সারদানন্দকে বিদেশে খাবার টেবিলে বসে কি করে 'সুসভ্য' হয়ে খেতে হয় তা শেখালেন– 'বাঁ হাতে কাঁটা ধরে মুখে তুলতে হয়, অত বড় বড় গরস করে না, ছোট ছোট গরস করবি। খাবার সময় দাঁত জিভ বের করতে নেই, কাশবি না, ধীরে ধীরে চিবুবি। আর নাক ফোঁস ফোঁস কখনও করবি না।'

টেবিলের তলা দিয়ে স্বামী সারদানন্দের পা চেপে ধরে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন– ছুরি ডান হাতে ধরতে হয়, বাঁ হাতে নয়।

একবার ঐ বিদেশেই মাছ এল বাড়িতে। কপির তরকারি। গুডউইন সাহেব সঙ্গে। তিনি মাছ খেলেন না, স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন– মাছ কেন তিনি খেলেন?

স্বামীজী স্বভাবরসিকতায় হাস তে হাসতে বললেন– বুড়ি ঝিতো! না খেলে এটা নর্দমায় ফেলত, তাই ওটা আমি পেটে ফেলেছি।'

আবার বিদেশে স্নানপর্ব সম্পর্কে লিখেছেন:

পাশ্চাত্যে স্নান মানে কি মুখটি ধোয়া, মাথাটি ধোয়া, হাত ধোয়া যা বাইরে দেখা যায়। প্যারিস সভ্যতার রাজধানী প্যারিস, রং ঢং ভোগ বিলাসের ভূ-স্বর্গ, বিদ্যা শিল্পের কেন্দ্র প্যারিস, সেই প্যারিসে এক বৎসর এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন। এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন, রাজভোগ খাওয়া দাওয়া, কিন্তু স্নানের নামটি নেই। দুদিন ঠায় সহ্য করে শেষে আর পারা গেল না। শেষে বন্ধুকে বলতে হল– দাদা তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি হয়েছে। এই দারুণ গরমিকাল, তাতে স্নান করার জো নেই, হন্যে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে।... স্নানের জায়গা কোথাও নেই, আলাদা স্নানাগার আছে, সেখানে চার পাঁচ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি। সেদিন বিকেলে কাগজে পড়া গেল– এক বুড়ি স্নান করতে টবের মধ্যে বসেছিল, সেখানেই মারা পড়েছে। কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ির চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাত!! এর একটি কথা অতিরঞ্জিত নয়।'

এই হচ্ছেন বিবেকানন্দ। মৃত্যুকে আসন্ন জেনেও রসিকতা করেছেন, 'আমি খুব সুখী। বঙ্গভূমি আমাকে যখনতখন হাঁপানি দেয়। কিন্তু সেটাও ক্রমশঃ পোষ মানছে। দুটি ভয়াবহ আপদ– ব্রাইটিস ডিজিজ আর ডায়াবেটিস পুরোপুরি পালিয়েছে।'

এই জনই আবার ধর্মের গভীরতাকে ছুঁইয়ে দেন:

'ধন থাকলে দারিদ্র্যের ভয়, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয়, রূপে বার্ধক্যের ভয়, যশে নিন্দুকের ভয়, অভ্যুদয়ে ঈর্ষার ভয়, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সমুদয়ই ভয়যুক্ত। তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সকল কিছু ত্যাগ করেছেন।'

গুরুশি ষ্যের এই মিষ্টতাপূর্ণ বিষয়গুলো আমাদের মুগ্ধ করে। প্রত্যেক ধর্মপুরুষই ব্যক্তিজীবনে সংসারের মধ্যে থেকেছেন, আবার বৈরাগ্যের কঠোরতাকে আলিঙ্গনও করেছেন। যিশু বলেছেন– 'শিশুদের আমার নিকট আসতে দাও, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদের।' এই শিশু কার ইঙ্গিত করে? সারল্যের, নিষ্পাপতার। সরল করে গভীর দর্শনকে যিনি বুঝিয়ে দিতে পারেন, তিনিই সম্যক জ্ঞানী। তিনিই নির্ভীক।

গুরুশি ষ্যের নিষ্পাপ সরল মুখ আমাদের অন্তরে আনন্দ দান করে। ঠাকুরের ছবি কিংবা স্বামীজীর ছবিগুলো দেখলে প্রত্যয় জন্মে– মুখের অমলিন স্মিতহাস্য এক রহস্যময় সারল্যের প্রকাশমাত্র। এ হাসি ধরা যায় না, বর্ণিত রসনিঃসৃত বাক্য, রস আস্বাদনে সুযোগ এনে দেয় এবং আমাদের জীবনে এক সুনির্মল বোধকে জাগিয়ে তোলে–

'এই দুনিয়ার সুখদুঃ খের পূতিগন্ধময় বাষ্পের ঊর্ধ্বে আমি উঠে যাচ্ছি, এগুলি আমার কাছে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা স্বপ্নের রাজ্য, এখানে আনন্দ উপভোগই বা কি, আর কান্নাই বা কি? সে সব স্বপ্ন বই তো নয়... কোন কিছুর জন্যই আর দুঃখিত হতে পারি না। সকল বোধের অতীত এক শান্তি আমি লাভ করেছি, তা আনন্দ বা দুঃখের কোনটাই নয়, অথচ দুয়েরই ঊর্ধ্বে।'

ড. মারুফী খান শিক্ষাবিদ, গবেষক

happy 2014 Coca-Cola

'Coca-Cola', 'Coke', the 'Contour Bottle' and the 'Dynamic Ribbon' are the registered trademarks of The Coca-Cola Company. 'Coca-Cola' contains no fruit. 'Coca-Cola' contains added flavours.

ভ্রমণ

বদলে যাচ্ছে ভারত

সোহরাব হাসান

১৫ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেই বুঝতে পারলাম, ভারত বদলে যাচ্ছে। দেয়ালে রঙিন চিত্রমালা ও বাহারি বিজ্ঞাপনে সুসজ্জিত বিশাল বিমানবন্দর। অনেকটা পথ হেঁটে আগমনী লাউঞ্জে এলাম। বাইরে অপেক্ষমাণ ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা তেজেন্দার আকন্দ এবং তাঁর সহকর্মীরা। দিল্লি, বেঙ্গালুরু ও মহীশূর– তিন জায়গাতেই আমাদের সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন তেজেন্দার। হাসিখুশি চমৎকার মানুষ। সবার প্রয়োজন ও সুবিধাঅসুবিধার ব্যাপারে সদাসজাগ।

২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে গিয়েও দেখলাম, দিল্লি বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজ চলছে। ভেতরেবাই রে ছিমছাম। সব সড়কের পাশে সবুজ গাছের সারি; মোড়ে মোড়ে সবুজ সড়কদ্বীপ। বিমানবন্দর থেকে সোজা অশোকা রোডের পাঁচতারা সাংগ্রিলা হোটেল। ধনবানদের জন্য মানানসই। কিন্তু আমাদের মত মজুর সাংবাদিকদের জন্য এত দামী হোটেল কেন? প্রশ্নটি আগেও করেছিলাম। এ রকম হোটেলে সমাজের ওপরতলার কিছু মানুষের দেখা পাওয়া যায়, সমাজকে জানা যায় না।

সফরকারী দলে আমরা ছিলাম ১২ জন সাংবাদিক– শাহ হুসেইন ইমাম, আবুল মোমেন, শাহীন রেজা নূর, আবু সাঈদ খান, সাইফুল আলম, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, রেজোয়ানুল হক, মুজতবা দানিশ, পীর হাবিবুর রহমান, মাসুদ কামাল খান, এস এম আকাশ ও আমি। এই প্রতিনিধিদলে সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকলেও জেন্ডার ব্যালান্স ছিল না।

কর্মসূচি অনুযায়ী ওই দিন বিকেলেই আমরা গেলাম কুতুবমিনারে। মোহাম্মদ ঘোরি যখন ভারতের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তখন তাঁর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেক পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করেন। সেই বিজয়ের প্রতীক হিসেবে কুতুবমিনার তৈরি করেন। এটি ৭২ দশমিক ৫ মিটার বা ২৩৭ দশমিক ৮ ফুট উঁচু। ইটনির্মিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ মিনার। মিনারের দেয়ালে খোদিত পবিত্র কোরআনের আয়াত। ভারতে ইসলামি স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মিনারকে ঘিরে আরও কিছু স্থাপনা রয়েছে।

কুতুবমিনারের শীর্ষদেশে ওঠারও ব্যবস্থা আছে। এর ভেতর দিয়ে যে সোপানপথ আছে, সেটি আগে খোলা ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে স্কুলছাত্রীদের একটি দল এটি পরিদর্শনে এসে দুর্ঘটনায় পড়লে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দিল্লির আরেকটি আকর্ষণীয় স্থান ইন্ডিয়া গেট। স্যার এডউইন লুটিয়েনসএর নকশাকৃত এই গেটটি মূলত ভারতের যুদ্ধস্মারক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তৃতীয় ইংরেজআফগান যুদ্ধে নিহত ৯০ হাজার ব্রিটিশ সেনার স্মরণে নির্মিত। লাল বালুপাথর ও গ্রানাইট নির্মিত। ইন্ডিয়া গেট আনুমানিক তিন লাখ ছয় হাজার বর্গমিটার এলাকা নিয়ে তৈরি। ভারতের স্বাধীনতা দিবসের কুজকাওয়াজ রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে শুরু হয়ে ইন্ডিয়া গেট হয়ে লাল কেল্লা পৌঁছায়। দিল্লির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই স্থাপনাটি দেশি বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান। সব শ্রেণি পেশার মানুষ এখানে আসেন– কেউ ক্লান্তি দূর করতে, কেউবা স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ভুলতে।

দিল্লিতে দর্শনীয় স্থান অনেক, হুমায়ুনের সৌধ, লোটাস টেম্পল, দিল্লি জামা মসজিদ, লোদি গার্ডেন, রেড ফোর্ড বা লাল কেল্লা, চাঁদনিচক, জাতীয় জাদুঘর, রেলওয়ে জাদুঘর, যন্তরমন্তর, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার, রাজঘাট। অনেকগুলোতে আগেই গিয়েছি। তাই দ্বিতীয়বার যাওয়ার আগ্রহ ছিল না। দিল্লি এমনিতেই সবুজ শহর। তিন মেয়াদের মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত আরও শ্রীমণ্ডিত করেছেন। ভারত বরাবরই প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল। দিল্লি বেঙ্গালুরু ও মহীশূর– যেখানেই গিয়েছি সবুজের সমারোহ। ঐতিহ্যের প্রতিও রয়েছে তাদের অপরিসীম যত্ন ও পরিচর্চা। প্রতিটি পুরোনো স্থাপনা তারা সংরক্ষণ করে। এ কারণেই ভারত শক, হুন, আর্য, অনার্য, মোগল, পাঠান– সবার দেশ হয়েছে।

প্রতিদিনই সকালবিকাল আমা দের কর্মসূচি ছিল। ফাঁকে কেউ কেউ মার্কেটও ঘুরেছেন। দিল্লিতে আমাদের সবচেয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে মোবাইলের সিমকার্ড নিয়ে। বাংলাদেশের মত এখানে যে কেউ য়ে কোন স্থান থেকে সিমকার্ড নিতে পারেন না। ছবির পাশাপাশি দিল্লির অস্থায়ী ঠিকানা দিতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের ২৪ ঘণ্টা আগে সিম চালু হবে না। সবাই আইন মেনে চলে। আইন না মানলে মোটা অংকের জরিমানা।

দিনের কর্মসূচি শেষে সন্ধ্যার পর আমরা ছিলাম স্বাধীন এবং ইচ্ছামত বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি এবং প্রতি সন্ধ্যায় দিল্লি প্রেসক্লাবের আতিথ্য গ্রহণ করেছি। ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। কোন কোন আড্ডায় দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস মিনিস্টার ইনাম আহমেদ চৌধুরী ও বাসসের প্রতিনিধি সুভাষ চন্দ বাদলও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

দিল্লি প্রেসক্লাবটি পরিসরে ছোট হলেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত। সঙ্গে পানাহার। দিল্লির গণমাধ্যমগুলোতেও বাঙালি সাংবাদিকদের প্রভাব লক্ষণীয়। *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*এর স ম্পাদক শেখর গুপ্ত বাঙালি। বাঙালি নিখিল চক্রবর্তী ছিলেন *মেইন স্ট্রিম* পত্রিকার সম্পাদক। বর্তমানে তাঁর ছেলে সুমিত চক্রবর্তী এটি সম্পাদনা করেন। *প্রথম আলো*র দিল্লি প্রতিনিধি সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। জয়ন্ত ঘোষাল, গৌতম লাহিড়ী, দীপাঞ্জন রায় চৌধুরীসহ

পাহাড় ও সবুজে ঘেরা দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়

অনেকের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল।

১৬ সেপ্টেম্বর আমাদের প্রথম আনুষ্ঠানিকতা ছিল ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবন পরিদর্শন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়। এই ভবনে ২০০১ সালে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল। পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্করএ তাইয়েবা ও জয়সি মোহাম্মদের কাজ। তাই, বর্তমানে ভবনটিতে কয়েক পাল্লার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের লোকসভা, রাজ্যসভা কক্ষ এবং যৌথ সভা কক্ষ দেখানো হলো। ১৯২১ সালে এই ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। বালুপাথ রে নির্মিত। বিশাল এই ভবনের করিডর ২৪৭টি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত। এই ভবনে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতা মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরূ, জওহরলাল নেহরু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাস্কর্য আছে। আছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সরোজিনী নাইডুর পাশাপাশি ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজি দেশাই প্রমুখের প্রতিকৃতিও।

ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানালেন ভারতীয় পার্লামেন্ট স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উপদেষ্টা রাশিদ আলভি। ভারতে লোকসভার সদস্যসংখ্যা ৫৪৫। এর মধ্যে ৫৪৩ জন জনগণ দ্বারা নির্বাচত হন, দুজন রাষ্ট্রপতি মনোনীত। রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৫০। এর মধ্যে ২৩৮ জন নির্বাচিত হন বিধানসভার সদস্যদের ভোটে, আর ১২ জন রাষ্ট্রপতির মনোনীত। ফলে জনপ্রতিনিধিত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকে এবং গণতন্ত্রের নামে দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ কম।

ওই দিন বিকেলে গেলাম জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্পের র‍্যাপিড ইনকিউবেশন সেন্টারে। সেখানে দেখলাম দুধ, বিস্কুট, তারকাঁটা, প্লাস্টিক বোতল, সুতা, কাপড়, চকলেট, চানাচুর ইত্যাদি বানানোর ছোট ছোট যন্ত্র। কারিগরেরা কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক জানালেন, সারা দেশে লাখ লাখ তরুণতরুণীকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। ঋণ দেওয়া হয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেই যন্ত্রটি চালানোর জন্য। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসব ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করে তরুণেরা আত্মকর্মসংস্থান করেছেন। এখান থেকে বাংলাদেশের কর্মীরাও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। একই আদলে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্প সংস্থা (বিসিক) গড়ে তোলা হয়েছিল। জেলা শহরগুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয় বিসিক নগরী।

১৭ সেপ্টেম্বর সকালে নির্বাচন কমিশনের মহাপরিচালক ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনা হয় ভারতের নির্বাচনপদ্ধতি সম্পর্কে। ভারতের তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন বেশ শক্তিশালী। সাবেক সিইসি টি এন সেশন নির্বাচন কমিশনকে একটি উচ্চতায় নিয়ে যান। একজন সচিবের নেতৃত্বে প্রতিটি রাজ্যে আছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের সময় কমিশন নির্বাহী বিভাগকে যে নির্দেশ দেয়, তারা তা মানতে বাধ্য। কেউ আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল, এমনকি নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর সদস্যপদও বাতিল করতে পারে ইসি। গত ছয় দশকে প্রতিষ্ঠানটি কখনই বড় ধরনের বিতর্কের মুখে পড়েনি। সবাই আইন ও জনরায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তি।

ভারতের অর্থনীতির আকার বিশাল। ক্রয়ক্ষমতার বিচারে দেশটির অবস্থান তৃতীয়– যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের পরেই। গত ১৫ বছরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়নএ দাঁড়ি য়েছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করছেন ইউরোপ, আমেরিকা থেকে শুরু করে দূরের ও কাছের উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও। ভারতের অগ্রগতির বড় জায়গা তথ্যপ্রযুক্তি খাত। ১৯৯৮ সালে বেঙ্গালুরু আইটিসিটি ঘুরে দেখেছি, সেখানে বসে তরুণেরা আমেরিকার বিভিন্ন আউটসোর্সিং করেও অনেক অর্থ আয় করেন। তথ্যপ্রযুক্তি রপ্তানিতেও ভারত অনেক এগিয়ে।

২০১১ সালে নয়াদিল্লিতে ভারতের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে যখন কথা বলেছিলাম, তাঁরা আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন, ভারতে বাংলাদেশি পণ্যের মান যাচাইয়ের যে সমস্যা আছে, তা শিগগিরই কেটে যাবে। বাংলাদেশের মান যাচাই প্রতিষ্ঠান বিএসটিআইকে আধুনিকায়নেও তাঁরা সহায়তা করবেন। ফলে বিএসটিআইয়ের সনদ থাকলে সেটি ভারতেও গ্রহণযোগ্য হবে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহজীকরণ তথা বাংলাদেশি পণ্য ভারতের বাজারে প্রবেশে নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকায় বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি এখনও আশানুরূপভাবে হচ্ছে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন বেড়েছে। ২০১১১২ সা লে বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করেছে ৫৮৪ দশমিক ৬৮ মিলিয়ন ডলারের পণ্য; বিপরীতে বাংলাদেশ আমদানি করেছে ৫ দশমিক ৮৪ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। ভারত বাণিজ্য ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশের আওতায় বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়ে থাকে। শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটানও অনুরূপ সুবিধা পায়।

বাংলাদেশের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি পণ্য ভারত রপ্তানি করা সত্ত্বেও দেশটির সড়ক ও বন্দরসুবিধা নাজুক ও অপর্যাপ্ত। ফলে স্থলবন্দরের কাছে পণ্যবাহী শত শত ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সড়কপথে বাংলাদেশে ভারতীয় যে পরিমাণ পণ্য আসে বা বাংলাদেশ থেকে ভারতে যায়, তার ৮০ শতাংশই লেনদেন হয় বেনাপোল ও পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে; অথচ এই বন্দরের ভারতীয় অংশের সুযোগসুবিধা সীমিত। পেট্রাপোলকলকাতা সড়কটিও অত ন্ত অপ্রশস্ত।

১৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে আবুল মোমেন, শাহীন রেজা নূর ও আমি দিল্লির পাহাড় ও সবুজে ঘেরা জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে (জেএনইউ) যাই। এটিকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশ্ববিদ্যালয়। কেবল স্নাতকোত্তর ও এমফিল পিএইচ ডির শিক্ষার্থীরাই এখানে পড়ার সুযোগ পান। এক হাজার একর এলাকা নিয়ে মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে জেএনইউএর ক্যাম্পাস। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের পর সম্ভবত এটাই ভারতের প্রকৃতিনির্ভর শিক্ষালয়।

১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যথাক্রমে ১০টি স্কুল আছে। শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব, বায়ো টেকনোলজি, কম্পিউটার এন্ড সিস্টেম সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, কম্পিউটেশান ও ইন্টিগ্রেটিভ সায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন, জীবনবিজ্ঞান, শারীর বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান। এছাড়া আছে চারটি বিশেষ কেন্দ্র: মোলিকিউলার মেডিসিন, সংস্কৃত অধ্যয়ন, আইন ও শাসন অধ্যয়ন ও ন্যানো অধ্যয়ন। এর অধীনে আছে আরও ৬টি প্রতিরার ইনস্টিটিউশন ও ১১টি প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান। পুরোপুরি আবাসিক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য আছে ১৭টি হোস্টেল। জেএনইউএর অ্যাকাডেমিক যোগাযোগ আছে পৃথিবীর নামকরা দুই শতাধিক অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে। জেএনইউতে বাংলাদেশের বেশকিছু ছেলেমেয়ে পড়েন। তাদেরই একজন তৌহিদ রেজা নূর, শহীদ সাংবাদিক সিরাজউদ্দীন হোসেনের ছেলে। তিনিই আমাদের ক্যাম্পাসটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। তৌহিদ একবার বিদেশি ছাত্র সংসদের সভাপতিও ছিলেন। কথা হল সোনিয়া আশরাফি, শাম্মি নামের আরও দুজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে। তাঁরা বললেন, এখানে নানা ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেন, ছাত্রাবাসে থাকেন, কোন সমস্যা হয় না।

আলাপ হল জেএনইউএর উপাচার্য সুধীরকুমার সোপোরির সঙ্গেও। বায়োটেকনোলজির এই খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ বাংলাদেশের হালনাগাদ খোঁজখবর রাখেন। একাধিকবার ঢাকায় এসেছেন। তিনি বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের মেধা ও শ্রমের প্রশংসা করলেন। তিনি আমাদের দ্বিমাসিক জার্নালের সাম্প্রতিক সংখ্যাটি দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন, স্কুল ও কেন্দ্রের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানের মাধ্যম। বাংলাদেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের জার্নাল প্রকাশিত হয় বলে জানা নেই।

১৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে আমরা মত বিনিময় করি ভারতের রেলমন্ত্রী মল্লিকার্জুন খারগের সঙ্গে। তিনি পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশের রেলওয়ের সম্পূরক ভূমিকার কথা জানালেন। আখাউড়া ও আগরতলার মধ্যে রেলওয়ে সংযোগ তৈরি করার উদ্দেশে বাংলাদেশ ও ভারত চুক্তি সই করে ১৬ জানুয়ারি, ২০১৩। বর্তমানে ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে সপ্তাহে দু'দিন মৈত্রী ট্রেন চলাচল করছে। এর সময় ১২ ঘণ্টা থেকে সাড়ে ১০ ঘণ্টায় কমিয়ে আনা হয়েছে। ফলে যাত্রী সংখ্যা বেড়েছে। চেকপোস্টে যাত্রীদের কাগজপত্র ও মালামাল পরীক্ষার সময় যাত্রীদের বসারও ব্যবস্থা রয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে ফিরতি টিকেট চালু হয়েছে। মন্ত্রী জানান, প্রতিবছর দুই লাখ মেট্রিক টন পণ্য পরিবহন করা হয়, যার ৯৯ শতাংশ ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে জিপসাম, পাথর, ড্রিঅ য়েলড কেক, পেঁয়াজ, চিনি ও খাদ্যশস্য, যার পরিবহন ব্যয় ট্রাকের চেয়ে অনেক কম। বাংলাদেশকে দেওয়া ঋণের বিপরীতে ৮০ কোটি ডলারের ১৬টি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার ১০টি রেলওয়ের। মূল্যমান ৬৮ কোটি ৭৪ লাখ ডলার। এর মধ্যে তিনটি কাজ শেষ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থায় রেলওয়ের বিরাট সম্ভাবনা আছে। ভারতীয় রেলওয়ের সঙ্গে সংযোগ করে বাংলাদেশ রেলওয়ে বছরে ১০০ কোটি মেট্রিক টনেরও বেশি পণ্য পরিবহন করতে পারে। ভারতের ঋণ সহায়তায় ভারতীয় সংস্থা ইরকনএর (IRCON) অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল দ্বিতীয় ভৈরব সেতু নির্মাণ এবং আখাউড়া আগরতলা রেলওয়ে সংযোগ।

অন্যদিকে রাইটস (RITES) বাংলাদেশ রেলওয়ের সহায়তায় লোকোমটিভ সরবরাহ, রোলিং স্টোন রক্ষণাবেণ ও ১৯৮৪ সাল থেকে বাংলাদেশের রেলকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। বর্তমানে সংস্থাটি ২৬ বিজি ডিজেল লোকোমটিভ সংগ্রহ এবং সৈয়দপুর নতুন কোচ প্রস্তুতকারী ইউনিটের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে।

বাংলাদেশে যেমন এফবিসিসিআই ভারতে তেমন সিআইআই। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ। অফিসে গিয়ে কিছুটা অবাক হলাম। কর্মকর্তাগ বেষক উপস্থাপক প্রায় সবাই বাঙালি। গবেষকদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশে বা ভারতের অন্যত্র এটি দেখা যায় না।

ভারতের অর্থনীতি দ্রুত বিকাশমান। পৃথিবীর দশটি বৃহৎ অর্থনীতির মধ্যে ভারতের অবস্থান তৃতীয়। যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের পরই। ২০১২ সালে জিডিপির পরিমাণ ছিল ৪৮২৫ বিলিয়ন ডলার। ১৯৯৫ সালে যেখানে ধনীর সংখ্যা ছিল শূন্য ৩ শতাংশ, বর্তমানে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ। যদিও দারিদ্রের হার সেই অনুপাতে কমেনি। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে কৃষিতে অবদান ছিল ৩২ শতাংশ বর্তমানে ১৪ শতাংশ, সেবা খাতে ৪১ থেকে বেড়ে ৫৯এ দাঁড়ি য়েছে। শিক্ষা খাতে ২৭ শতাংশ অপরিবর্তিত। ২০০৯১০ সা লে ভারতে জনসংখ্যা ১১৭ কোটি ৪০ লাখ, কর্মক্ষম ৪২ কোটি ৯০ লাখ। এর মধ্যে সংগঠিত খাতে ২৮ কোটি ২০ লাখ ও অসংগঠিত খাতে ৩৭ কোটি ১৮ লাখ জনবল রয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমা দেশগুলোতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কমলেও ভারতে ছিল ৬.৩ শতাংশ। গত বছর কিছুটা কম হলেও এবছর ৬.৩ শতাংশে উন্নীত হবে আশা করা যায়।

২০১০ সালে শেখ হাসিনার দিল্লি সফরকালে সিআইআই একটি অংশীদারি অধিবেশনের আয়োজন করে। যাতে বাংলাদেশেরও ৮৫ জন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি যোগ দেন। ২০১২ সালে তাঁর ত্রিপুরা সফরের সময়েও বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করে। ২০১৩র ৫ জুন দুই দেশের মধ্যে সামরিক বিনিয়োগের উদ্দেশে সিআইআই বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড, ভারত্ব বাংলাদেশ যৌথ শিল্প ও বাণিজ্য সমিতির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। যার অধীনে একটি টাস্কফোর্স বাধাসমূহ দূর করার কাজে নিয়োজিত আছে। দুই দেশের মধ্যে বহুমাত্রিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বেড়ে চলেছে এবং তাতে দুই দেশের মানুষই উপকৃত হচ্ছে।

(পরের কিস্তিতে থাকবে বাঙ্গালুরু ভ্রমণের অভিজ্ঞতা)

সোহরাব হাসান কবি, সাংবাদিক

ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে সপ্তাহে দু'দিন চলাচলকারী মৈত্রী এক্সপ্রেস

ছোটগল্প

সম্পত্তি

হোসেনউদ্দীন হোসেন

অগ্রহায়ণ মাস। মাঠ থেকে পাকা ধান কেটে চাষীরা যার যার উঠোনে এনে তুলছে। ঝাড়াই বাছাই করে গোলায় ঢালছে। ঘরেঘরে একটা খুশি খুশি আলোড়ন। হঠাৎ করে সেই আলোড়নে ভাটা দেখা দিল। চারদিকে যেভাবে চুরিচামারি হচ্ছে, তাতে ভাটা নামারই কথা। এমন কোন রাত নেই যে চুরি হচ্ছে না। চাষীরা দিশাহারা হয়ে গেল। ক্রমান্বয়ে চোরেদের উৎপাতও বাড়তে লাগল।

এরপরেও দেখা দিয়েছে নানারকম সমস্যা। মহাজনরাও বাড়িতে এসে উপদ্রব শুরু করেছে। চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের ধান আদায় করছে। চোখ রাঙিয়ে এক মন ধানের পরিবর্তে আদায় করছে তিন মন ধান। বলছে, 'হয় লোনের টাকা দে– তা না হলে জমি লিখে দে– ইবার পরিশোধ না করলি খবর আছে।' একটা বেআইনি জোর-জুলুম চলছে সারা এলাকা জুড়ে। চাষীরা মহাজনদের হুমকিতে তটস্থ। সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে পোষা লেঠেল বাহিনি। কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেও সাহস করে না।

কয়েকদিন আগে এই বেআইনি সুদ আদায়ের বিরুদ্ধে বিরহামপুরের কয়েকজন কৃষক প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ফল ভাল হয়নি। ক্ষেপে গিয়ে কয়েকজন মহাজন লেঠেলবাহিনি এনে বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে। মারপিট করে দেখিয়ে দিয়েছে তাদের শক্তির দাপট। একেবারে মগের মুলুকে পরিণত হয়ে উঠেছে পুরো তলাট।

একদিকে চলছে চোরেদের দাপট, অন্যদিকে মহাজনদের। এলাকার সাধারণ লোকের ধারণা, মহাজনদের মধ্যে যেমন একটা জোট রয়েছে, তেমনি চোরেদের মধ্যেও রয়েছে আরেকটি জোট। উভয় জোটের উদ্দেশ্য একটাই, লুটেপুটে খাওয়া।

বাড়িঘরে হামলার সংবাদ শুনে হামজেরের মাথা গরম হয়ে উঠল। কয়েকজন চাষীকে নিয়ে সেও একটা জোট তৈরি করল। মহাজনের বিরুদ্ধে জোট, মগের মুলক পেয়েছ নাকি? ইবার হামলা করলে, পাল্টা হামলা হবে।

বুদোগাজী বলল, ঘরভাঙা, মারপিট করা আইনের চোখে ঘোরতর অপরাধ।

হামজের বলল, অপরাধতো বটেই– এখনই উচিত আদালতে গিয়ে মামলা রুজু করা।

মামলার কথা শুনে একেবারে চুপসে গেল মহাজনরা। দুর্ভাবনায় মাথাটা বিগড়ে যেতে লাগল। এতদিন ছিল একরকম। এখন বিষয়টি অন্যরকম হয়ে উঠেছে। গ্রামের চাষাদের মধ্যেও একটা আন্দোলন দেখা দিয়েছে। একবার যদি আদালতে গিয়ে মামলা ঠুকে দেয়, তখন কি রকম হবে অবস্থা? এ নিয়ে একটা গুজবও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হামজের চাষাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মামলার নামে চাঁদাও তুলছে। তলাটের চাষারাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মহাজনদের দেখে নেবে এবার। খবরটা শুনে মহাজনরা আরো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। জোট বেঁধে তারা উকিলের সেরেস্তায় গিয়ে হাজির হল। বিষয় শুনে উকিল বললেন, চাষারা যদি হামলার বিষয়টি আদালতে প্রমাণ করতে পারে– তবে নিঘঘাত জেল। কেউ রেহাই পাবা না। যে টাকা সুদে খাটাচ্ছ, এটাতো বেআইনি কারবার। একটা হবে হামলার বিরুদ্ধে মামলা, আর একটা হবে বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে মামলা। করেছডা কী? বুঝলে, আলবত ফেঁসে যাবা তোমরা–

সব উকিলই একই রকম যুক্তি দেখিয়েছে। এতকাল এই আইন নিয়ে কেউ কোন ভাবনা-চিন্তা করেনি। গায়ের জোরেই হয় কাজ নয় করেছে। থানায়ও কেউ কখনো অভিযোগ জানায়নি। অতএব কোনটা আইন এবং কোনটা আইন নয়– এটা নিয়ে কোনদিন মাথা ব্যথা ছিল না। নিজেদের মর্জিমত যখন যা খুশি তখন তাই করে বেড়িয়েছে।

আদালতের ঝানু উকিল মির্জা সফিউলাহ বললেন, সুদের ব্যবসা চালাতে গেলে সরকারের অনুমোদন লাগে। কারবারের আয় বাবদ কর পরিশোধেরও আইন রয়েছে। একটা ঝামেলার কারণে আরো কয়েকটা ঝামেলার ফাঁদে আটকে যাবে তোমরা। তারচেয়ে একটা কাজ করোগে– কেচটা রুজু হওয়ার আগে মিটমাট করে ফেলাও।

উকিলের কথা শুনে আরো ভীত হয়ে পড়ল মহাজনরা। মাথায় একটা দুর্ভাবনা নিয়ে গ্রামে ফিরে মহাজনরা গোপনে ক্ষতিগ্রস্ত চাষাদের সঙ্গে মিলতাল করে ফেলল। সরল সহজ মানুষগুলোকে ডেকে এনে মাথায় হাত ঘষে দিল। মাথার তালুতে একটু হাত ঘষে দিতেই চাষারা ভাবাবেগে কেঁদে ফেলল। কেউ একবার জিগ্যেস করল না, ঘর ভেঙে দেওয়া হল ক্যানো? পিঠের দাঁড়া লাঠি মেরে ভেঙে দেওয়া হল ক্যানো? ক্ষতিপূরণের জন্য কেউ কোন দাবি জানাল না। বরং উল্টো আরো হাতজোড় করে লোন পরিশোধ করতে পারেনি বলে মাফ চেয়ে নিল। বলল, আলাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, তিনমাসের মধ্যে লোন পরিশোধ করে দেব। দেনা ঘাড়ে করে আমরা কেউ কবরে যাব না। আর ক'দিন বাঁচব? কবরের আজাব থেকে মুক্তি চাই।

মহাজনরা তাজ্জব হয়ে গেল। এ রকম যে একটা ঘটবে, ওরা কখনো কল্পনাও করেনি।

মহাজনরা বলল, তিনমাসের মধ্যে দিতে পারবা?

চাষারা বলল, সাধ্যমত চেষ্টা করব।

মহাজনরা বলল, ঠিক আছে, তিনমাসের মধ্যেই দিও।

আর একবার চাষাদের মাথার তালুতে হাত বুলিয়ে দিল ওরা। চাষারা খুশি হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মহাজনরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। কয়েকদিন দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় উদ্বিগ্ন ছিল ওরা। খাওয়াদাওয়া ছিল না। রা তে ঘুমও ছিল না। একটা অজানা আশঙ্কা মাথার উপরে ভর করেছিল।

চাষারা চলে যেতেই আক্রোশে ফেটে পড়ল নূর আলী মহাজন।

– বুঝলে, ওই হামজের শালা চাষাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

– হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামেগ্রামে ঢুকে আমাদের বিরুদ্ধে লোকগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছে। অথচ, দেখা গেল মামলা করার ব্যাপারে চাষাদের উৎসাহ নেই। মামলার জিগির তুলেছে হামজের।

হ্যাঁ, জব্বার মহাজন বলল, কারবারটা একেবারে লাটে উঠে যাওয়ার মত হয়েছিল। এখন শালা ওই হামজেরকে জব্দ করা দরকার। তা না হলে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে।

করিম বকস বলল, কোন হই চই করা যাবে না। কৌশলে হারামজাদাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিতে হবে। আর যেন কোনদিন মাথা তুলে না দাঁড়ায়।

কয়েকদিন পর মামলার বিষয়টি নিয়ে চাষাদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হামজের বুঝতে পারল মহাজনদের বাড়িতে বসে রাতের অন্ধকারে তারা বিবাদটা ফয়সালা করে এসেছে।

– ফয়সালা করে এলে ক্যান?

– না করে উপায় বা ছিল কী?

– কোন জোর জুলুম করেছে নাকি?

চাষারা বলল, নাহ্। লোন দেব বলে তিনমাস সময় নিয়ে এসেছি।

হামজের বলল, ঘর ভাঙার টাকা পেয়েছ কি?

– নাহ্।

– চিকিচ্ছের টাকা?

– কিছুই নিইনি।

মহাখাপ্পা হয়ে উঠল হামজের।

– বুঝলে, সুদখোর মহাজনের পালায় যখন পড়েছ, তখন রেহাই পাবা না। ভিটেমাটি বিক্রি করেও রেহাই পাবা না। এই টাকা কদ্দিন আগে নিয়েছিলে?

– পাঁচ বছর আগে।

– এখনো শোধ হয়নি?

– নাহ্। কিতেয় কিতেয় টাকা দিচ্ছি। তবুও এখনো দেনা। গাছ টাকা পরিশোধ হয়ে গেছে। সুদের টাকা–

– হ্যাঁ, যতই দিন যাচ্ছে, ততই সুদের টাকা বাড়ছে। বিশগুণ দিয়েও মুক্তি পাওনি। মরে যাবা, লোনের বোঝা চাপিয়ে যাবা তোমার ছাবা চ্চার ঘাড়ে।

– লোন যখন নিয়েছি, তখন পরিশোধতো করতেই হবে। তা না হলে মরে গেলে গোর আজাব হবে।

– যে গোর আজাবের ভয়ে তিন মাস সময় নিয়ে এলে, আলাহ্‌র কসম খেয়ে এলে, সেই আলস্নাহ তো সুদ খাওয়া হারাম করে দিয়েছে। মিটমাট করা উচিত হয়নি। বাড়ি ভাঙার খেসারত, চিকিচ্ছের খরচ, তাও আদায় করতে পারোনি। শেষ পর্যন্ত 'ব'কলমে টিপ মেরে এসেছ।

চাষারা হা করে হামজেরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ক্ষোভেদুঃ খেঅভিমা নে নিজের আঙুল নিজেই বসে বসে মটকাল হামজের। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চাষাদের বাড়ি থেকে উঠে এসেছিল সে। ঘেন্নায়ল জ্ঞায় কারো সঙ্গে কথা বলেনি। তিনমাস ক্ষতিগ্রস্ত চাষাদের কোন খোঁজখবরও নেয়নি। একদিন হাঁটতে হাঁটতে বুদোগাজীর বাড়িতে গেল সে। বেচারার দুর্গতি দেখে অবাক হয়ে গেল। চোরেরা রাতের অন্ধকারে সিঁদ কেটে ঘরের মধ্যে যত মালসামান ছিল, সব লুটেপুটে নিয়ে গেছে। এখন সবচেয়ে বড় কষ্ট তার অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট। লজ্জা নিবারণের জন্য ঘরে কোন কাপড়চোপড় নেই। ঘরের হাতনেয় বসে কপাল থাবড়াচ্ছে সে।

বুদোগাজী বলল, একটু মাথা তুলে দাঁড়াব– সে শক্তিটুকু নেই। ভিক্ষে করা ছাড়া ছাবা চ্চা বাঁচাব কি করে? এখন মাথায় চিন্তা ঢুকেছে, জব্বার মহাজনের কাছে গিয়ে

কয়েকদিন গ্রামে এপাড়া-ওপাড়া মনের আবেগে ছুটোছুটি করে বেড়াল হামজের। সিঁদকাটা চোরের উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে সে গ্রামের যুবকদের নিয়ে রাতের বেলা পাহারার ব্যবস্থা করল। গ্রামের জোয়ানজোয়ান যুবকরা রাতের বেলা এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে গ্রাম পাহারা দিতে লাগল। ওপাড়ার যুবকরা রাতের বেলা চিৎকার করে উঠলে এপাড়ার যুবকরাও দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করে সাড়া দিতে লাগল।

হাতেপায়ে ধরে লোন নিয়ে আসি। আর ক'দিন উপোশ থাকবে আমার কচি বাল্‌বাচ্চারা?

বুদোগাজীর শরীরও শুকিয়ে গেছে। চিন্তাজ্বর কাবু করে ফেলেছে বুদোগাজীকে। কঠিন এক ব্যাধিতে ধুঁকতে ধুঁকতে হয়তোবা একদিন কবরে চলে যাবে। একটা নাভিশ্বাস ছাড়ল বুদোগাজী। কোন সান্ত্বনা দিতে পারেনি হামজের। নীরবে ওর বাড়ি থেকে উঠে এসেছিল সে। ওর বউটাও হঠাৎ করে কেমন যেন বোবার মত হয়ে গেছে। মুখরা রমণী ছিল মনোয়ারা। এখন মুখে কথা নেই। আঁচলে মুখ ঢেকে ঝিমমেরে বসে থাকে মনোয়ারা। চোখেমুখে একটা চোরচোর আতঙ্ক। ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এইতো এখন ওই পরিবারের দশা।

কয়েকদিন গ্রামে এপাড়াওপাড়া ম নের আবেগে ছুটোছুটি করে বেড়াল হামজের। সিঁদকাটা চোরের উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে সে গ্রামের যুবকদের নিয়ে রাতের বেলা পাহারার ব্যবস্থা করল। গ্রামের জোয়ানজোয়ান যুবকরা রাতের বেলা এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে গ্রাম পাহারা দিতে লাগল। ওপাড়ার যুবকরা রাতের বেলা চিৎকার করে উঠলে এপাড়ার যুবকরাও দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করে সাড়া দিতে লাগল।

দবিরুদ্দিন মহাজন এই ব্যাপারটা নিয়ে একদিন ফ্যাকড়া তুলল। গ্রামের ছানাউল্লাহ মেম্বারের বৈঠকখানায় একটা মজলিশ বসিয়ে অভিযোগ জানাল, আমার রাতের ঘুম এই গ্রামপাহারাদারদের চিৎকারে নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ির চৌরাস্তায় কি আছে? চোর না ডাকাত? আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরাতে চেঁচাচ্ছে? ঠাণ্ডা কর, তা যদি না পার তবে আমি থানায় গিয়ে মামলা ঠুকব। রাতপাহারা দেওয়ার জন্য কি থানা কোন হুকুম দিয়েছে?

ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ছানাউল্লাহ গ্রামপাহারাদারদের তলব করল।

কাসেম মোল্লা বলল, অভিযোগ মিথ্যা। আমরা কেউ দবির মহাজনের বাড়ির চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে অকারণে হল্লা করিনে।

ছানাউল্লাহ জিগ্যেস করল, পাহারা দিতে হুকুম দিয়েছে কেডা?

আলেক মোড়ল বলল, হামজের।

ছানাউল্লাহ হুকুম করল, ডেকে আন হামজেরকে।

হামজের খবর শুনেই মজলিশে এসে হাজির হল।

– বলেন মেম্বার সাহেব, কি কারণে তলব করেছেন?

– এই যে, রাতের বেলা তোমরা গ্রাম চৌকি দাও, হুকুম দিয়েছে কেডা?

– হুকুম দেবে কেডা? আমরাই আমাদের স্বার্থে গ্রাম চৌকি দিচ্ছি।

– এর জন্যেতো কাউন্সিলের চৌকিদার আছে। তোমরা চৌকি দেওয়ার কেডা?

– বললামতো আমাদের স্বার্থে আমরাই চৌকি দিচ্ছি। এ যাবৎ দিলে তো আর রাতের বেলা চোরেরা এসে সিঁদ কাটত না। চুরি ছ্যাচড়ামিও হত না। আসলে চোরদের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটছে বলে, এ রকম অভিযোগ করা হয়েছে।

– মুখ সামলে কথা বল হামজের। রুখে উঠল গোলাম রব্বানী মহাজন।

হামজেরও রুখে উঠল। সিঁদকাটা চোরদের বিরুদ্ধে তো কেউ কথা বল না। বুঝেছি এর মধ্যেও তোমাদের একটা স্বার্থ রয়েছে। আমরা আমাদের মালমাত্তা রক্ষা করছি বলে গ্রাম পাহারা দিচ্ছি। তাতে হয়েছে কি?

চাষারা জৈজকার করে হামজেরের বক্তব্যকে সমর্থন জানাল। আমাদের জানমালের নিরাপত্তা তোমাদের চৌকিদারও দেয় না– এমনকি থানাও দেয় না। এখন আমরাই আমাদের এই দায়িত্ব পালন করছি। কোথায় কার রাতের ঘুম হল আর না হল আমাদের কিছু যায় আসে না।

মহাজনরা হামজেরের কথার জবাব দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত্ব মজলিশও ভেঙে গেল। গ্রাম পাহারাদাররা হৈ হল্লা করে মজলিশ থেকে বেরিয়ে এল।

খবির মহাজন বলল, এমন করে যে আমরা ওদের কাছে অপদস্থ হব, তা কল্পনাও করিনি। গম্ভীর হয়ে মহাজনরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ কোন কথা বলেনি।

কয়েকমাস পার হয়ে গেল। মহাজনরা তাগেবাগে ছিল। এক ফ্যাকড়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছে হামজেরকে। ওর ভাই লিচু মোড়লের কাছ থেকে বসতবাড়ির সমুদয় অংশ কিনে নিয়েছে জয়নাল মহাজন। বিক্রয়ের টাকাটা পুরোপুরি পরিশোধ হয়নি। অর্ধেক নগদ। অর্ধেক বাকি। একান্নবর্তী সংসার। হঠাৎ করে এক মুরগি নিয়ে ঝঞ্জাট বাধিয়ে লিচু মোড়ল নিজের সংসার আলাদা করে নিয়েছে। গ্রামের মোড়লমহাজন দের ডেকে এনেছিল লিচু মোড়ল। তারাই ছিল লিচু মোড়লের আলাদা হওয়ার যুক্তিদাতা। এখন ভিটের অংশ বিক্রি করে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাচ্ছে লিচু মোড়ল। পাড়ায় ঘুরতে গিয়ে এই সংবাদ শুনে হতভম্ব হয়ে গেল হামজের।

নিজাম মোড়ল বলল, তোর ভাই নাকি ভিটের অংশ বেচে দিয়েছে?

– কেডা বলল, বেচে দিয়েছে?

– ক্যান তুই কিছুই জানিসনে?

– না, কিছুই জানিনে।

– একেবারে পানির দরে বেচে দিয়েছে।

– কার কাছে বেচে দিয়েছে?

– জয়নাল মহাজন নিয়েছে।

জয়নালের নাম শুনে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল হামজের। দূরের কোন দুঃসবাদ নয়। নিজের ঘরের খবর শুনছে নিজাম মোড়লের মুখ থেকে। শরীরটা হিম হয়ে আসতে লাগল। বাড়িতে এসে সোজাসুজি লিচু মোড়লের ঘরে ঢুকল হামজের। লিচু মোড়ল বসে বসে বিড়ি টানছিল।

– একটা খবর শুনলাম মিয়াভাই।

লিচু মোড়ল ওর দিকে তাকাল। কি খবর বল?

– তুমি নাকি ভিটে বেচে দিয়েছ?

– হ্যাঁ, বেচে দিয়েছি।

– আমারে দিলে না ক্যান?

– তোর কাছে টাকা আছে না কি?

– জোগাড় করতাম।

লিচুর বউ এসে সামনে দাঁড়াল। গাল চেপরিয়ে পান চিবুচ্ছে। ঠোঁট বেঁকিয়ে সে বলল, তুমি টাকা দিলেও আমি রাজি হতাম না।

– ক্যান, রাজি হতে না ক্যান?

– তোমার বউ আমার বাপ তুলে গালি দিয়েছে। ওই মাগিটার সুখের আশায় তোমার নামে অংশ লিখে দেব, ভাবলে কি করে?

– এমন একজনের কাছে বেচে দিয়েছ যে, একদিনও এই ভিটেয় আমি বাস করতে পাব না।

– এই কারণেই তো জয়নালের কাছে বেচে দিয়েছি। ঠিক শাস্তি পাবে তোমার ওই মাগিটা। মুখ ঝামটা মেরে ঘরে থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল লিচুর বউ।

হতভম্ব হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে রইল হামজের। মাথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে। তাকে ঘিরে বিশাল

ভ্যানের উপর বসে দু'পাশের দৃশ্য দেখতে লাগল দোলেনা। গ্রাম মাঠ জলাশয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। কালনা রানিপুকুর হিজলি শাঁখারিপাতা গাতিপাড়া মাধবকাটি এড়োল বিল। গোপলার বাওড়। আঁকাবাঁকা রাস্তা। ভ্যান রিকশ হেলেদুলে ছুটে যাচ্ছে। আকাশটা নীল সমুদ্রের মত দেখাচ্ছে। কোথাও ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। মিষ্টি মিষ্টি রোদ। সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসেছে। মধুখালি গ্রামের মধ্যে ঢুকল ভ্যান রিকশটা। মনটা উৎফুল-হয়ে উঠল দোলেনার। আর মাত্র দুটো গ্রাম পার হলেই কুসুমপুরে ঢুকবে সে।

একটা ষড়যন্ত্র। হাত কচলিয়ে এদিকওদিক ছুটে বেড়িয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যাবে না। তবুও কয়েকদিন এরওর কা ছে গিয়ে পরামর্শ নিল। সহজ কোন পথে হাঁটার কথা কেউ বলতে পারল না। কেউ কেউ পরামর্শ দিল, আদালতে গিয়ে মামলা করগে।

রেজিস্ট্রি অফিসে কয়েকদিন দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াল হামজের। দলিলের নকল তুলেই সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। যে টাকা দলিলে লেখা হয়েছে, সে টাকা জোগাড় করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। আরো দুশ্চিন্তায় ওর খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। দিশাহারা হয়ে পাগলের মত এখানেওখা নে ঘুরে বেড়াতে লাগল হামজের। কেউ কেউ উপহাস করল, আসলে স্বভাবটাই তোমার খারাপ।

– আমি তো খারাপ কাজ করিনি?

– তবে লোক ড়োপায়ে বেড়াও ক্যান?

– নিজের ভাইয়ের সঙ্গেও তো তোমার বনিবনা নেই।

গ্রামের রোস্তম আলী বলল, মহাজনের কাছে যাও। মহাজন ছাড়া টাকা কেউ দেবে না।

হামজের বলল, ওরাইতো আমার উপরে ড়্যাপা। আমারে কলে ফেলে মজা দেখছে। এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে আর এক ভাইকে লেলিয়ে দিয়েছে।

রোস্তম আলী বলল, এই দুর্দিনে ওরা ছাড়া আর কেউ টাকা দেবে না।

এর মধ্যে হামজেরের স্বাস্থ্য অনেকখানি ভেঙে পড়েছে। মুখটা গোলগাল ছিল। এখন চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে। কপালে বলিরেখা পড়েছে। সমস্ত শরীর জুড়ে দেখা দিয়েছে ধস। হাঁটতে গেলে ঠ্যাং দুটোয় শক্তি খুঁজে পায় না হামজের। যতই দিন যাচ্ছে, ততই অথর্ব হয়ে পড়েছে সে। মাথায় দারুণ একটা দুশ্চিন্তা।

ওর শরীরের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল দোলেনা। হাতনের বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিল হামজের। দোলেনা ওর কাছে এসে দাঁড়াল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আর হা-হুতাশ কোরো না। আমাদের নসিবের ফের। ওগো চিন্তা করে করে আর ক'দিন কাটাব?

দোলেনার কথা শুনে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল হামজেরের। সে ক্ষেপে উঠল। থাম দেখি তুই। তোর জন্যেইতো আমার এই দুর্দশা। সামান্য একটা মুরগি নিয়ে যদি গোলমাল না করতিস আজ এই ঝামেলা হত না।

দোলেনা বলল, গোলমাল কি শুধু আমি বাধালাম? সব দোষ কী আমার? হামজের চোখ পাকিয়ে বলল, তবে গোলমাল করতে গেল কেডা? এক মুরগির কারণে তো এই গোলমাল। তা না হলে এই বিপত্তি দেখা দিত না। এখন শালা, নিজের বাপের ভিটেও হাতের মধ্যে থাকছে না।

গাল ফুলিয়ে উঠে গেল দোলেনা। ওর সঙ্গে কোন তর্কবিতর্ক করল না। নিজের মধ্যে কেমন যেন একটা মরামরা ভাব। কি করে ঝামেলামুক্ত হওয়া যায়– এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে মাথাটা গুলিয়ে যেতে লাগল। অগাধ জলে ডুবে যাওয়ার মত দশা হয়েছে। রাতের বেলায় সে ঘুমুতে পারল না।

ভোরবেলা উঠে দোলেনা হামজেরকে বলল, আমি একটু কুসুমপুরে যেতে চাই।

হামজের বলল, ক্যান?

গিয়ে দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা? দোলেনার গলাটা বুজে এল।

হামজের ওর দিকে তাকিয়ে মরাহাসি হাসল। দেখ, কোন কিছু আনতে পারিস কী না।

ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইল দোলেনা। তারপর একটা নাভিশ্বাস ছেড়ে বলল, এ যাবৎ কিছুইতো নিইনি। বাপের সম্পত্তি আছে। দু'আনা অংশতো পাব। বেচলেও তো একগাদা টাকা।

– যা। অন্ধকারের মধ্যে একবিন্দু আলো দেখল হামজের। কখন ফিরবি?

– হয়তো কাল কিংবা পরশু। কোন দুশ্চিন্তা করবা না। যাচ্ছি যখন, তখন খালি হাতে ফিরব না।

আবার একটা মরাহাসি হাসল হামজের। ঘর থেকে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়াল সে। মনটা বিষণ্ন ছিল। দোলেনার কথা শুনে গায়ে-গতরে হিম হয়ে যাওয়া শিরাউপশিরায় র ক্ত বইতে শুরু করল। একটা আশার আলো দেখছে সে। মাথায় ভারি পাথরের মত যে দুর্ভাবনা ছিল, তা আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে।

দোলেনা বলল, একটুও চিন্তা করবা না।

পুবের সূর্য বেশ উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। খেয়েদেয়ে ভ্যান রিকশয় উঠল দোলেনা। ওর দিকে তাকিয়ে রইল হামজের।

দোলেনা বলল, একটুও দুশ্চিন্তা করবা না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল হামজের। যা, আলার উপরেই ভরসা।

ভ্যান রিকশর চাকা ঘুরতে শুরু করল। উঠোন থেকে রাস্তায় উঠল গাড়িটা। চলন্ত গাড়ির দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল হামজের। এক সময় দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। প্রায় আট বছর হল বিয়ে করেছে হামজের। কুসুমপুরের বিশ্বাসবাড়িতেই বিয়ে করেছে সে। ঘটা করে বিয়ে হয়েছিল ওদের। কফিল বিশ্বাসের অবস্থা খুব ভাল না হলেও খুব মন্দও ছিল না। এক মেয়ে দুই ছেলের জনক ছিল কফিল বিশ্বাস। দোলেনা ছিল আদরের মেয়ে। মেয়েকে সাজিয়ে-গুছিয়ে হামজেরের হাতে তুলে দিয়েছিল। একটা দুধের গাইও কিনে দিয়েছিল। মাসে মাসে এটা ওটা ঘাড়ে করে বয়ে এনে মেয়েকে দেখে যেত কফিল বিশ্বাস। আরো অনেক কিছু বাপ দিতে চেয়েছিল দোলেনাকে। হঠাৎ করে বাপজান মরে যাওয়ায় ওর কপালে আর কিছু জোটেনি। বেঁচে থাকলে অনেক কিছু আদায় করতে পারত দোলেনা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে।

প্রায় পাঁচ বছর হল বাপের বাড়ি যায়নি দোলেনা। সেই একবার কুসুমপুর গিয়েছিল বাপজানের মৃত্যুর সংবাদ শুনে। তারপর আর যাওয়া হয়নি। এই আর একবার কুসুমপুরে যাচ্ছে সে।

ভ্যান রিকশটা ছুটতে লাগল। আগে রাস্ত্মার অবস্থা ভাল ছিল না। এখন অনেকটা চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠেছে। ছোট রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত হয়েছে। ভ্যানের উপর বসে দু'পাশের দৃশ্য দেখতে লাগল দোলেনা। গ্রাম মাঠ জলাশয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। কালনা রানিপুকুর হিজলি শাঁখারিপাতা গাতিপাড়া মাধবকাটি এড়োল বিল। গোপলার বাওড়। আঁকাবাঁকা রাস্ত্মা। ভ্যান রিকশ হেলেদুলে ছুটে যাচ্ছে। আকাশটা নীল সমুদ্রের মত দেখাচ্ছে। কোথাও ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। মিষ্টি মিষ্টি রোদ। সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসেছে। মধুখালি গ্রামের মধ্যে ঢুকল ভ্যান রিকশটা। মনটা উৎফুল-হয়ে উঠল দোলেনার। আর মাত্র দুটো গ্রাম পার হলেই কুসুমপুরে ঢুকবে সে। একেবারে খালি হাতে যাচ্ছে সে। মনটা হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে উঠল। একটা বাচ্চা হয়েছিল। তিনমাসের মাথায় বাচ্চাটা মারা গিয়েছে। এখনো বুকের মধ্যে শোক। এখনো বুকের মধ্যে কান্না গুমরে গুমরে ওঠে। মৃত বাচ্চার চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কোলটা খালি। শূন্যকোল নিয়ে কুসুমপুরে

যেতে হচ্ছে। হঠাৎ বুকের মধ্যে হু হু করে উঠল। বাপের কথা মনে পড়ছে। মায়ের কথা মনে পড়ছে। শৈশব-কৈশোরের ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি মনের মধ্যে বারবার ঠেলেঠেলে উঠছে। সে বসে বসে ভাবতে লাগল। অনেকদিন হল, বাদশাভাই রাজাভাইকে দেখেনি। বাপ আদর করে বড় ভাইয়ের নাম রেখেছিল বাদশা। মা রেখেছিল ছোট ভাইয়ের নাম। বড়টা বাদশা, ছোটটা রাজা। রাজাভাই দোলেনার তিন বছরের বড়।

কেমন আছে এখন ওরা? বহুকাল কেউ কারো খবর রাখে না। ক্রমান্বয়ে সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল দোলেনা।

মধ্যদুপুরে কুসুমপুরে ঢুকল ভ্যানটা। সেই আমকাঁঠা লের বাগানটা এখন নেই। গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ত আমবাগান। আমবাগান ছাড়ালেই বাঁশবাগান। এখন সেখানে ঘরবাড়ি উ ঠেছে। গ্রামটা আগের মত নেই। অনেকখানি বদলে গিয়েছে। কেমন যেন অপরিচিত বলে মনে হতে লাগল দোলেনার। মোড়লপাড়া পার হয়ে বিশ্বাসবাড়িতে এসে ভ্যান রিকশটার গতি থেমে গেল। ভ্যান থেকে নামল দোলেনা। জায়গাটা একেবারে অপরিচিত হয়ে উঠছে।

দোলেনা বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের হাতনেয় বসে বিড়ি ফুকছে বাদশা। রান্নাঘরে ধোঁয়া উড়ছে। ভাবী রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে উঠোনের দিকে তাকাল। দোলেনাকে চিনতে পারল না। বাদশাও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চেনা চেনা। অথচ চেনা যাচ্ছে না। ভাঙা স্বাস্থ্য। রোগাটে শরীর। কেমন যেন ঘোরঘোর লাগছে। অবশেষে চিনতে পেরে, চেঁচিয়ে উঠল বাদশা আ... রে..., দু... লু...।

দোলেনা থপথপ করে হেঁটে ঘরের হাতনেয় উঠল।

– কেমন আছিস দুলু?

– ভাল নেই ভাইয়া। নানারকম বিপদের মধ্যে আছি।

– তোর আবার বিপদ কি?

– আর বোলো না ভাইয়া। এই কারণেই তো এসেছি।

– ও খোকার মা, হাদে দ্যাখো, দুলু এসেছে। কেমন রোগাটে হয়ে গেছে দুলু।

নাদুসনুদুস গোলগাল স্বাস্থ্য ছিল দোলেনার। একটা আকর্ষণীয় চেহারা ছিল ওর। গায়ের রঙ ছিল গোলাপী। এখন রঙটা কালচে হয়ে উঠেছে।

খোকার মা মাথায় আঁচল টানতে টানতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাতনেয় উঠে একটা মাদুর পেতে বসতে দিল। বুকভরে শ্বাস টানল দোলেনা।

বাদশা ভুঁড়ি বের করে গায়েগত রে দুই হাত দিয়ে তেল মালিশ করতে করতে উঠোনে নামল। এখন তার গোসল করা হয়নি।

– বয় দুলু, এক দৌড়ে গিয়ে গা ধুয়ে আসি। লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঠপুকুরে গোসল করতে গেল বাদশা।

দুলু মাদুরের উপর বসে রইল। খোকার মা আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। কীভাবে নিজের বিষয়টা ভাইয়ের কাছে খুলে বলবে, তাই নিয়ে বসে বসে চিন্তা করতে লাগল দোলেনা।

দুপুর বেলা রাজাও এসে দেখা করে গেল দোলেনার সঙ্গে। তার চলনেবলনে একটা ভারি ব্যস্তসমস্ত ভাব।

– কেমন আছিস দুলু?

– ভাল নেই ভাইয়া।

– কোন অসুখটসুখ নাকি? দেখছি শুকিয়ে গেছিস?

মরাহাসি হাসল দোলেনা। তোমরাতো একবারও দেখতে যাও না–

– এত ব্যস্ত থাকি যে সময় করতে পারিনে।

– আমি মরলাম না কি বাঁচলাম, কোন খোঁজ খবর নেও না? গলাটা ভিজে উঠল দোলেনার।

– বুঝলি, একটু তোদের বাড়িতে যাব, সে সময়টুকুও নেই। তোর সঙ্গে বসে যে একদ-কাটাব, সে সময়টুকুও আমার হাতে নেই। তড়বড় করে কথা বলতে বলতে সিগারেট ফুকতে ফুকতে দ্রুন্নত চলে গেল রাজা।

রাজার বউ বলল, ওর স্বভাবটাই হল এই রকম। একবেলাও সে বাড়িতে থাকে না। এই যে গেল আর পাত্তা পাওয়া যাবে না।

দোলেনা জিগ্যেস করল, রাজাভাই কি করে এখন?

– কি জানি, কি করে, তাও বলতে পারব না। রাজার বউ দাঁত মেলে হাসল।

দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘরের হাতনেয় আবার ঝিমমেরে বসে রইল দোলেনা। ভাবীরা নিজেদের সংসার নিয়ে মহাব্যস্ত। দোলেনার সঙ্গে বসে যে দু'একটা কথা বলবে, সে ফুরসুত নেই। অগত্যা, একাকী বসে নিজের সমস্যা নিয়ে নিজেই ভাবতে লাগল সে। মাথার মধ্যে দুর্ভাবনাগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আসছে। বাদশাভাইও ঘরের মধ্যে ঢুকে দিবানিদ্রায় নাক ডাকছে। তারও যে দোলেনার কথা শোনার আগ্রহ আছে, তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা তোলপাড় করে দিচ্ছে।

সন্ধ্যার পরে নিজেই গরজ করে বাদশার কাছে এসে বসল দোলেনা। বাদশা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ওকে দেখে বলল, কিরে দুলু, কিছু বলবি নাকি?

– হ্যাঁ ভাইয়া, বলবার জন্যেই তো এসেছি।

– তবে তাড়াতাড়ি বল। বাইরে যেতে হবে।

দোলেনা বলল, মহা সমস্যার মধ্যে আছি ভাইয়া।

– যা বলবি, তাড়াতাড়ি বল।

বাদশার মুখের দিকে তাকাল দোলেনা।

– একটা মুরগি নিয়েই গোলমাল। বড় ভাসুরের সম্বন্ধি এসেছিল। বড়জা আমার সেই মুরগিটা ধরে জবাই করতে গিয়েছিল। বলেছিলাম, ডিমপাড়া মুরগিটাকে জবাই করতে দেব না। শুরু হল ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হয়েছে যে ভিটেবাড়ির অংশটাও বেচে দিয়েছে। এখন মাথার উপরে সাংঘাতিক বিপদ। বাদশা বলল, তোরা কিনে নিলিনে ক্যান?

– আমাদের না জানিয়েই বেচে দিয়েছে।

– যার কাছে বেচে দিয়েছে, তার কাছ থেকে কিনে নিগে যা।

– এখন আমরা হকশেফা করতে চাই।

– তবে আর বিপদটা কি?

– এই কারণেই তোমার কাছে এসেছি ভাইয়া।

বাদশা বলল, দেখ, আমরা কোন লাঠিবাজি করতে পারব না। কোন হুড়হাঙ্গামা করতে পারব না। যেটা ভাল মনে করিস, সেটাই করগে যা–।

দোলেনার গলা ভিজে উঠল, হকশেফা করতে গেলে একগাদা টাকা দরকার। বাদশা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই দরকার।

– এই টাকা আমার হাতে নেই।

– তবে জোগাড় করে নিগে যা–।

– আমি এই কারণেই তোমার কাছে এসেছি ভাইয়া।

বাদশা ঝিমমেরে বসে রইল।

দোলেনা বলল, আমারে হাজার বিশেক টাকা দাও।

বাদশা বলল, দুলু, আমি তোকে টাকা দিতে পারব না।

দোলেনা বলল, অনেক আশা করে এসেছি ভাইয়া। আমারে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না।

– বললাম তো, একটা টাকাও দিতে পারব না।

– না দিলে যে আমার পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

– বুঝলি, আমি কিন্তু একটা ফুটো পয়সাও দিতে পাব না। কনথেকে দেব?

– তবে তো আমার বিপদ। মাথায় হাত দিয়ে বসল দোলেনা।

– দেখ দুলু, একটা পয়সাও আমি দিতে পারব না।

– তা হলে কি তুমি চাও আমি পথে গিয়ে বসি? আমার বিপদেআপ দে যদি সাহায্য না করো, তবে তোমরা কি রকম ভাই?

– বললামতো কনথেকে দেব?

– যেখান থেকে পার, সেখান থেকে দাও।

– দেখ দুলু, তোরা কি আমার কাছে টাকা জমা রেখেছিস?

দুলু দু'চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

– তবে এক কাজ কর মিয়াভাই। আমি উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের সম্পত্তির যে অংশটুকু পাব, তাই বেচে টাকা দাও। জীবনে আর কুনোদিন তোমাদের কাছে এসে হাত পাতব না।

– তোর আবার অংশ কোথায়?

– কোন, বাপমায়ের জমিজমার অংশ?

মুখ টিপে হাসল বাদশা। তোর এরকম

কোন সম্পত্তি নেই।

– কেডা বলল, সম্পত্তি নেই?

হো হো করে হাসল বাদশা। মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। চোখ উল্টিয়ে বলল, বাপের কবরে গিয়ে জিগ্যেস করগে যা– ঘর থেকে গলা ফাটিয়ে রাজাকে হাঁক মেরে ডাকল, এ... ই... রাজা, বেরিয়ে আয়, দুলু সম্পত্তির ভাগ নিতে এসেছে। ওরে বুঝিয়ে দে ওর সম্পত্তি কোথায়?

রাজা ঘরের মধ্যে থেকে হেলেদুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

– কি হয়েছে মিয়াভাই?

ধূর্ত শিয়ালের মত খ্যাকখ্যাক আওয়াজ করে বাদশা রাজাকে বলল, দুলুকে জিগ্যেস কর ওর সম্পত্তি কোথায়?

দোলেনাও চিৎকার করে উঠল, তোমরা যে বাপের ব্যাটা– আমিও তো সেই বাপের বেটি, আমি কোন অংশ পাব না?

রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, দেখ, এইভাবে চিলস্নাবিনে, অংশ যদি থাকে তবে আইন করে নিগে যা– বাপ তোর জন্য কোন অংশ দিয়ে যায়নি।

– কেডা বলল অংশ দিয়ে যায়নি?

– আমরাই বলছি, অংশ রেখে যায়নি। মায় সম্পত্তি আমাদের দু'ভাইয়ের নামে লিখে দিয়ে গেছে।

– মিথ্যে কথা। হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল দোলেনা।

হইচই ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল। ক্ষোভে-দুঃখে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল দোলেনা।

বাদশা রাজাকে বলল, কি করবি কর।

রাজার মাথা আরো গরম হয়ে উঠল। সে ধমক দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল।

এ... ই, থাম। তা না হলি, সম্পত্তি কিভাবে পাবি বুঝোয়ে দিবানে।

দুলু আরো চিৎকার করে উঠল। কেন মারবা নাকি?

রাজা ওর মাথার চুল টেনে ধরল। গলা ধাক্কা দিয়ে কয়েকটা লাথি মারল। উঠোনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল দোলেনা।

হৈ হুলা শুনে পাড়াপড়শিরা ছু টে এল। মার খেয়ে উঠোনে পড়ে রইল দোলেনা। দুপুররাতে পাড়ার এক জ্ঞাতিভাইয়ের বউ এসে উঠোন থেকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল দোলেনাকে। হারেজ বিশ্বাস বলল, কেঁদে আর করবি কি দুলু, চাচা কোন দলিল করে যাননি। একজনকে নকল বাপ সাজায়ে, বাদশা আর রাজা জাল দলিল তৈরি করে নিয়েছিল। সে তো অনেকদিন আগের কথা। আর কি করবি দুলু, সবই তোর কপালের ফের।

পরদিন সকাল বেলা। হারেজ বিশ্বাস একটা গরুর গাড়ি জোগাড় করে দিল। সেই গাড়িতে চড়ে ফিরে এল দোলেনা। শরীরটা একেবারে ভেঙে গিয়েছে। গায়েগত রে ব্যাথা। মৃত মানুষের মত গাড়িতে শুয়ে আছে সে। একটু উঠে নড়েচড়ে বসবে, সে শক্তিটুকুও নেই।

গাড়িটা বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল। হামজের হাতনেয় বসে তাকিয়ে দেখল গাড়ির উপর শুয়ে আছে দোলেনা। সে ছুটে গিয়ে দোলেনাকে পাঁজাকোলা করে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। লিচুর বউ তাকিয়ে দেখল দৃশ্যটা। পাড়াপড়শিরাও ছুটে এল হন্তদন্ত হয়ে। উঠোনেও একটা ছোটখাটো ভিড় জমে উঠল।

সকলেই জানার জন্য কৌতূহলি হয়ে উঠেছে।

– হয়েছেডা কি?

লিচুর বউ গাল চেদরিয়ে বলল, যা হবার, তাই হয়েছে। দু'দিন আগে ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিল টাকা আনতি– মুড়ো ঝাঁটা মেরেছে– সেই ঝাঁটা মেরে এমন দশা করে দিয়েছে যে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই। শেষ পর্যন্ত একটা গরুর গাড়িতে তুলে দিয়েছে। হি হি করে হাসতে হাসতে ঘরের ছেঁচেয় দাঁড়িয়ে হাত নেড়েনেড়ে বলতে লাগল লিচুর বউ।

পাড়াপড়শিরা লিচুর বউয়ের অঙ্গভঙ্গি হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে।

ঘর থেকে উগ্রমূর্তিতে বেরিয়ে এল হামজের। রাগে তার শরীর কাঁপছে।

– এই মাগি, মুখ সামলে কথা বল। তা না হলি বুঝোয়ে দিবানে।

লিচুর বউ কোমরে আঁচল বেঁধে রম্নখে দাঁড়াল। উল্টোপাল্টা গালি দিতে লাগল।

রাগে দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার মত হল হামজেরের। বুকের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ মোচড় মেরে উঠে আসতে লাগল। লিচুর বউয়ের গালে জোরে একটা থাপ্পড় মারার জন্য ছুটে গেল সে।

শরীরটা থরথর করে কয়েকবার কেঁপে উঠল। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে অথর্বের মত দাঁড়িয়ে রইল সে। নিজেকে মনে হল, সে যেন মুর্দা হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন জয়নাল মহাজন তার দশটা লাঙল এনে উঠোনে চাষ দিতে লাগল। লিচুর বউ হি হি করে হাসতে লাগল।

হোসেনউদ্দীন হোসেন কথাশিল্পী

ঘটনাপঞ্জি ❖ জানুয়ারি

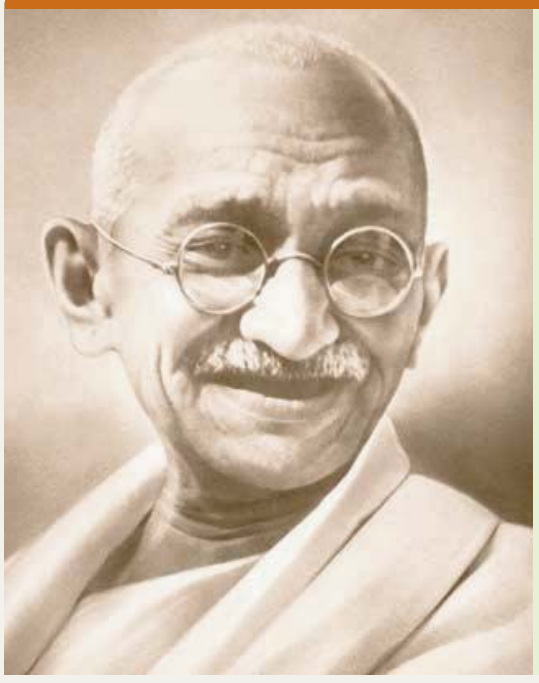
মহাত্মা গান্ধী

০১ জানুয়ারি ১৮৯০ ❖ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯১৪ ❖ অদ্বৈত মলবর্মণের জন্ম
০৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু
০৮ জানুয়ারি ১৯০৯ ❖ আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম
১০ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ ❖ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ ❖ মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি
১৪ জানুয়ারি ১৯২৬ ❖ মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯০১ ❖ সুকুমার সেনের জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ ❖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯০৫ ❖ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ ❖ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম
২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তর জন্ম
২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ প্রজাতন্ত্র দিবস ॥ ভারতীয় সংবিধান কার্যকর
৩০ জানুয়ারি ১৯১৬ ❖ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম
৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ ❖ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ॥ শহীদ দিবস

যুবতীধরম

রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

আমাদের যৌবন্নবয়স
শ্যামকানু তোমার পিছনে
বেলা গেলে দিনান্ত বিবশ
বেহিসেবি বীত পল গোনে

আমাদের রক্তে টান ছিল
ভালবাসা ছিল, পৃথিবীকে
আরো ভাল স্লেই ক রে দিল
রৌদ্রভরা স্বরলিপি লিখে

তমালবিপিনে ছিল মায়া
মায়া নীল কালিন্দীর নীরে
শ্যামল মেঘের ঘন ছায়া
দোলে কদম্বের ছায়া ঘিরে

তীব্র ঝড়ে খেয়ে পারাপার
গোপাঙ্গনা কাঁপি নিধুবনে
যমুনাবেলায় হাটবার
শ্যাম পারানির গান বোনে

আজ ভাবে সান্ধ্য অবকাশ,
এ সব কেবলই অপচয়?
হৃদিভরা হৃদয়বিলাস
স্মৃতি নয়, সেই তো সঞ্চয়।

রজতকান্তি সিংহচৌধুরী
ভারতের কবি

ধর্মাধর্ম

আশিক সালাম

মৌমাছির ধর্ম বিন্দু বিন্দু আহরণ
পিঁপড়ার ধর্ম শ্রমনিষ্ঠ প্রভিডেন্ড ফান্ড
বিড়ালের ধর্ম দেশপ্রেম
কুকুরের ধর্ম প্রভুভক্তি
কাকের ধর্ম স্বাজাত্যবোধ

মানুষের ধর্ম নয় মুহূর্মুহু মনুষ্যনিধন

ভেজা ফড়িঙের ডানা

সুহিতা সুলতানা

কুয়াশা ভেজা ঘাসের ওপর ভেজা ফড়িঙের ডানা
আগুনের ভয়ে থিতু হয়ে আছে।
তুমি কি নগ্নতার ঈশ্বর? আবদ্ধ প্রাচীরে
নিখুঁত সৌন্দর্য উড়িয়ে দিচ্ছ আমার চারপাশে?
এ দুঃসময়ে কেন তুমি জোনাকি আগুন হয়ে ধূসর বৃষ্টি ঝরাও?
অন্ধ আবেগ খেয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছ সময়?
ঘুমন্ত্ম বাটিতে মদের উল্লাস ঢেলে নগ্নতা হনন কর?
আজ বড় বিষণ্ন দিন। রুগ্ন বিকেল। স্তব্ধতার
মুখোমুখি দীর্ঘ চাঁদের ছায়ায় খেলা করে উন্মত্ত বালক।
ভরসন্ধ্যায় মাতাল হয়ে দগ্ধ হতে চায়;
পাহাড়ের চূড়ায় বসে ছুঁতে চায় রঙধনু মেঘ...

এক আশ্চর্য নীল জামদানি

রেহমান সিদ্দিক

প্রখর এ দুপুরকে বলা যায় রূপসী দুপুর
রূপের উত্তাপে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত আমি
অন্তহীন কাল ধরে ছুটে চলা
রূপ গোলকের দিকে

এক আশ্চর্য নীল জামদানির ঘোমটা টেনে
তুমি হেঁটে যাচ্ছ অলৌকিক রেস্তোরাঁর দিকে
যেখানে গ্রহ্লন ক্ষত্রের টুংটাং শব্দের সঙ্গে
কথা বলে অতিথিরা
আঁচলের ফাঁক গলে বের হচ্ছে রূপের ঝিলিক
আমি পুড়ে যাচ্ছি
পুড়তে পুড়তে পৌঁছে যাচ্ছি অলীক নগরে
ঝলস্লেযাওয়া আমার মুখ দেখে
তুমি কি চিনতে পার কে আমি আঁধার

অন্তহীন কাল ধরে
শাড়িটির রঙ আর নকশা বুঝবার চেষ্টা করছি
কিছুই পারছি না
বিস্ময়ে বিভোর হয়ে শুধু চেয়ে আছি
হাসির ঝিলিক
চিরন্তন রহস্যের অবয়বে মোড়া
আলোর ঘোমটা খুলে একবার তাকাবে কি আঁধারের দিকে?

এখন লজ্জিত নই

জ্যোতির্ময় দাশ

কাপড়জামার বদ লে এখন মুখোশ পরে থাকতে হয়

একটা মুখোশ পরে থাকি সকালে বাজারে যাবার সময়
অন্য একটা পরতে হয় শ্মশানব ন্ধু হবার মুহূর্তে–
কবিতা লেখার সময়ে যে মুখোশটা সচরাচর পরি
স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ার আগে সে মুখোশটা সরিয়ে রাখি
তখন খুঁজে নিতে হয় অন্য আর একটা বিকল্প মুখোশ

প্রত্যেকবার ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকি যে মুখোশটা পরে
সেটাকে বদলে নিতে হয় নন্দনে কবিতা পাঠের সময়–
আমার আলমারিতে দেখো আর কোন পোশাক নেই
থরে থরে সাজান আছে চৌষট্টিকলার যাবতীয় মুখোশ

অপরিসীম দ্বিধা আর সংকোচে থেকেছি একসময়,
আশপাশে সুশীল সকলে পোশাক ত্যাগ করেছে দেখে
এখন নগ্নতার জন্য আর কোন লজ্জা হয় না আমার...

জ্যোতির্ময় দাশ ভারতের কবি

জর্নাল

সিদ্ধার্থশঙ্কর ধর

অবশেষে ডেকে কাছে নিয়ে বসি ওই বালুকাবেলায়
নিজেকেই বলি ডেকে, শোন– এ যাত্রা গভীর কান্নার

কেমন বাজাও বাঁশি জলের নিকেতনে
কেমন কষ্ট দিয়ে বানালে প্রতিমা
তার মধ্যে আমার মত কবিকে খুঁজে পাও তুমি

রাত্রি এমন গাঢ় হলে ক্রমশ দীর্ঘশ্বাসগুলো
চারিদিক থেকে তাদেরকে পাহারা দেয়
যখন আমার সাথে হাঁটে একা মেয়ে
রূপোলি কলসী কাঁধে করে

মৃদু তরঙ্গগুলো অন্তঃস্থলে কিছু ফুল ফুটিয়েছে কেবল

দুই.
আমি তোমাকে ঘটনা ভুলতে বলি না কখনো
মনে রেখে দিও

যে তোমার প্রতি প্রতিশোধ নিতে পারেনি একদিন
মনে রেখে দিও

মনে রেখে দিও
তাই বলে প্রতিপক্ষ দুর্বল ছিল না

অতীত মানেই সুখদুঃ খের স্মৃতি

আনন্দমোহন রক্ষিত

কত কথা জাগে মনে
কত স্মৃতি মেঘের আড়ালে লুকায়
কাতর নয়নে তাই শুধু দেখে যাই
কেবলি বিষাদ ভাবনায়;

অতীত মানেই সুখদুঃ খের স্মৃতি
স্মৃতির আড়ালে বসবাস আমাদের অজানা সংসার
নাড়ির বন্ধন ছিঁড়ে অতীত হয়ে গেছে পিতামাতা
জ্যেষ্ঠ সহোদরস হোদরা আরও কত জ্ঞাতিগোত্র।

এরই মাঝে কত পূর্ণিমা এল্ল গেল পূর্ণ আভায়
কেবল আঁধারটাই ঠাঁই নিল অন্তরে বিষাদে
ধূসর পা-ুলিপির পৃষ্ঠা বাড়তে থাকে
মেঘের আড়ালে মেঘ বাড়তে থাকে মনের অগোচরে।

শৈশব কৈশোরের নিঃসঙ্গ সঙ্গী আমার
ধীরে অতি ধীরে বয়ে চলা স্বচ্ছ শিলক নদী
তার তীরে এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকা পবিত্র বেলগাছ,
তুলাতলি মাঠ যাবতীয় খেলাধূলার সঙ্গীসাথী
আজও মনে পড়ে এসব মুগ্ধ স্মৃতি কত সন্ধ্যার।

উজান রাজহংসী

সোহেল মাহবুব

চাঁদ একদিন বুকের ওড়না বিছিয়ে দিয়েছিল
কুমারী রাজহংসীর অহংকারী চাতালে।
চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার, মধ্যে সরু পাহাড়
তার ওপর এক টুকরো তরুণ আলো–
এই ছিল ফিরতি রাতের মৃদু ভাষণ।

আলোর দোলায় দুলে দুলে সারারাত ভেসে বেড়াত
সেই অপ্সরা রাজহংসী, কখনো জোনাকী কখনো তুষারের বেশে
নিষ্পলক দর্শনে শিশুরাও কখন যেন বড় হয়ে যেত
গোধূলির দরজা ঠেলে সন্ধ্যা তার ঘরে ঢুকতেই
সারা ঘরে বেজে উঠত কামসিঁদুরের ঘণ্টা!

যোজনগন্ধী হাওয়া হয়ে যেত হ্যামলিনের বাঁশির সুর
জন্মসূত্রে টান জেগে উঠত কোনায় কোনায়
বিনিময়ে পড়ে থাকত রাত্রি, ধুধু অন্ধকার, প্রশিক্ষিত জল।

সৌহার্দ

ভাগ করে নেওয়া ইতিহাসের সঙ্গে আট দিন

জিনাত জোয়ার্দার রিপা

আমন্ত্রণটা এসেছিল হঠাৎ করেই। জানতে চাওয়া হয়েছিল, ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী কিনা। এতটাই অবাক হ য়েছিলাম যে উত্তর দেওয়ার আগে যাচাই করলাম মোবাইলে ভেসে উঠা নম্বরটা। নাহ্! এ তো ভারতীয় দূতাবাসেরই নম্বর। তাহলে কোন ভুল হচ্ছে না। উত্তেজনার আঁচ দমন না করেই সম্মতি জানিয়ে দিলাম।

২১ থেকে ২৮ অক্টোবর, ২০১৩ ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের ১০০ তরুণ প্রতিনিধি গিয়েছিল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে। এই তরুণদের মধ্যে কেউ চিকিৎসক, কেউ প্রকৌশলী, তো কেউ শিক্ষার্থী, সাংবাদিক কিংবা ব্যবসায়ী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিপ্লব প্রথমবারের মত উড়োজাহাজে উঠেছেন ২১ অক্টোবর। জানালার পাশে আসন না পড়ায় তাঁর মন খারাপ। নিজ আসন থেকেই একটু পর পর ঘাড় উঁচিয়ে পাখির চোখে দেখছিলেন হাজার ফুট নিচের বাংলাদেশকে। সকাল সাড়ে ১১টায় আমরা গিয়ে পৌঁছলাম নয়াদিল্লি। হোটেল সম্রাট আমাদের পরবর্তী চার দিনের ঠিকানা। নিজের ঘর আর সঙ্গী বুঝে নিয়ে সবাই ছুটল দুপুরের খাবার খেতে। প্রথম দিন থেকেই আশ্চর্য এক সমন্বয় দেখা গেছে আমাদের একশোজনের মধ্যে। ঠিকঠাক ঘড়ির কাঁটা ধরে এগোচ্ছে সবাই। আর উপায়ই বা কি! সময় মেনে না চললে যে দোরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটা মিস হয়ে যাবে। দেখা হবে না দর্শনীয় কোন একটা স্থান। দিল্লির প্রথমদিন আমরা গিয়েছি কুতুবমিনারে। লাল বেলেপাথর আর সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি বিশ্বের সর্বোচ্চ এই মিনারটি তৈরি করান কুতুবউদ্দিন আইবেক। এর আশপাশে বেশকিছু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থাপনা আছে, যেগুলোকে একসঙ্গে 'কুতুব কমপ্লেক্স' বলা হয়। মিনারের শরীরজুড়ে আরবি ক্যালিগ্রাফির দৃষ্টিনন্দন নকশাকে যে যতটা পারল নিজের ক্যামেরায় পুরে নিল।

এক্ষেত্রে শুরু থেকেই এগিয়ে ছিল পুরো দলে সবচেয়ে ছটফটে মেয়ে ঐশী। নিজে ছবি তোলা বাদ দিয়ে শুধু স্থাপনা আর বন্ধুদের ছবি তুলে গেছে সে। সন্ধ্যার সময় আমরা ফিরলাম হোটেলের পথে। দিল্লির রাস্তার সন্ধ্যার সেই জ্যাম ঢাকাকে মনে করিয়ে দিল ক্ষণিকের জন্য।

পরদিন আমরা গিয়েছিলাম দিল্লির প্রসিদ্ধ জামা মসজিদ, রাজঘাট ও রেডফোর্টে (লাল কেল্লা)। প্রতিটি স্থাপনা আপন মহিমায় ভাস্বর। মোগল সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যপ্রীতির অনন্যসাধারণ নমুনা জামা মসজিদ, যা দিল্লির বৃহত্তম মসজিদ। লাল বেলেপাথর আর সাদা মার্বেল পাথরের এই মসজিদটি তৈরি করতে ছয় হাজার শ্রমিক সময় নিয়েছিলেন ছয় বছর। পাঞ্জাবি গাইড মনপ্রীত সিং যখন ইতিহাসের জানালা আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরলেন, তখন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের স্থাপত্যকৌশলের শিক্ষার্থী এষা, ফারিবা আর তুরিনের চোখে খেলছিল জিজ্ঞাসার দ্যুতি।

দিল্লির লাল কেল্লা, সম্রাট আকবরের তৈরি আগ্রা কেল্লার অনুকৃতি। সম্রাট শাহজাহান দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের পর এটি নির্মাণ করেছিলেন। স্থাপনার বিশালত্ব আর সৌন্দর্যে একশো তরুণ তৃষ্ণার্ত থেকেই চলে গেল রাজঘাট। যমুনা নদীর তীরে মহাত্মা গান্ধী রোডে অবস্থিত এই স্থাপনা মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি নিবেদিত। তাঁকে হত্যার পরদিন এখানেই তাঁর অন্তিম সৎকার হয়। কালো মার্বেল পাথরের ভিত্তিতে অবিরাম জ্বলতে থাকা অগ্নিশিখা তাঁর প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে নিরন্তর।

রাজঘাটের অগ্নিশিখা সবার পেটের আগুনকে মনে করিয়ে দিল। দুপুরের খাবার খেতে আমরা গেলাম হোটেল ব্রডওয়েতে। ঐতিহাসিক এই হোটেল ভারতের প্রথম আইএসও স্বীকৃত হোটেল। খাবারও বেশ সুস্বাদু। দিল্লি পরিচ্ছন্ন শহর। যদিও সেখানে পুরনো ঢাকার মতই পুরনো দিল্লি বেশ ঘনবসতিপূর্ণ। ভাত, ডাল থেকে রুটি, সবজি সবই পাওয়া যায় সহজেই। আর মুসলিম এলাকাগুলোয় প্রতি রাস্তার মোড়েই মিলবে কাবাব ও বিরিয়ানির দোকান। দুপুরে খাবারের পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ভারতের শিল্পসংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্যকে মনে করিয়ে দিল আরেকবার। রাতে আমরা যোগ দিলাম ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত নিমন্ত্রণে। সেই রাতের ভোজসভায় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছিল, তাতে ভারতীয় কথক নৃত্যকে সমানতালে টেক্কা দিয়েছে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থী মার্সেলের সাঁওতালি গান।

পরদিন আগ্রার তাজমহল দেখার উত্তেজনায় কারো চোখেই সে রাতে ঘুম ছিল না। তাজমহল! বছরের পর বছর শুনে আসা আশ্চর্যকে নিজের চোখে দেখা। এ এক অনন্য অনুভূতি! একে চোখে না দেখে, না ছুঁয়ে বলে বোঝানো সম্ভব নয় 'তাজমহল' কী? আগ্রা সরু রাস্তার যানজটের শহর। ভাবা যায় না মোগলসম্রাট শাহজাহান দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের আগে অবধি এটিই ছিল রাজধানী। এখানে শাহজাহানের পিতামহ সম্রাট আকবরের তৈরি আগ্রা ফোর্ট মোগল স্থাপনার আরেক অসাধারণ উদাহরণ। যমুনার এক পাড়ে আগ্রা ফোর্ট আর অন্য পাড়ে তাজমহল। আগ্রা ফোর্টের জানালা দিয়ে তাকালেই দেখা যায় সাদা পাথরের তাজমহল। শাহজাহানের ছেলে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনের লালসায় বাবাকে আগ্রা ফোর্টে বন্দি রেখেছিলেন। জীবনের শেষ আট বছর শাহজাহান এখানকার জানালা দিয়েই তাকিয়ে থাকতেন প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত ভালবাসার অভূতপূর্ব নিদর্শন তাজমহলের দিকে।

২৪ অক্টোবর আমাদের 'বাংলাদেশের জামাইবাবু' ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন। সকালে রাষ্ট্রীয় দূরদর্শন ও বেতারকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে ইন্ডিয়া গেট, জাতীয় জাদুঘর এবং সংসদীয় জাদুঘর দেখলাম আমরা। আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিহাসকে ভাগাভাগি করে নেওয়া ভারতকে তখন বড় বেশি আপন মনে হয়েছে, যখন জাদুঘরে দেখা মিলল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর তৈরি স্থাপনার। এ দিনের সন্ধ্যা আমাদের প্রতিনিধি দলের একশো তরুণের জীবনের সেরা সন্ধ্যার অন্যতম। সন্ধ্যা ছ'টায় রাষ্ট্রপতি ভবনে গেলাম আমরা। বাঙালি রাষ্ট্রপতির আন্তরিক আপ্যায়নে মুগ্ধ তরুণদল বাকি জীবনের সেরা স্মৃতিটা জমিয়ে নিল এখান থেকেই।

২৫, ২৬ ও ২৭ অক্টোবর আমাদের ঠিকানা ব্যাঙ্গালুরু। সেখানে প্রথম দিন আমাদের কেটেছে বিধান সৌধে। যেখানে মন্ত্রণালয় অবস্থিত। যানজটপূর্ণ শহরের খাবারের স্বাদের সঙ্গে বাঙালি খাবারের সাদৃশ্য মিলেছে অনেকাংশেই।

ভারতে কাটানো রোমাঞ্চকর সব দিনের অন্যতম একদিন ব্যাঙ্গালুরুতে কাটানো দ্বিতীয় দিন। এদিন প্রথমে আমরা গিয়েছি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ব্যাঙ্গালুরুতে। রোমাঞ্চ শতগুণ বেড়ে গেল যখন জানতে পারলাম এখানেই শুটিং হয়েছে সেই দুর্দান্ত মজার সিনেমা *থ্রি ইডিয়টস*এর। গণমাধ্যমকর্মী ইমাম, দোলা, আলিফ তো বটেই ব্যবসায়ী রানা, সুমনও বেছে বেছে সেই সব জায়গায় গিয়ে ছবি তুললেন যেখানে আমির খান আর সারমান জোশিরা দাপিয়ে বেড়িয়েছেন সিনেমার রিলে। এরপর আমাদের গন্তব্য ছিল ইনফোসিস। প্রযুক্তির শহর ব্যাঙ্গালুরুর নামকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করেছে এই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস ছবির মত সুন্দর। ব্যাঙ্গালুরুর শেষ দিনে আমরা গিয়েছিলাম প্লানেটোরিয়াম, টিপু সুলতানস প্যালেস আর ব্যাঙ্গালুরুর বোটানিক্যাল গার্ডেন লালবাগে। কোন জায়গা যে কোনটির চেয়ে বেশি সুন্দর সেটি বলা মুশকিল। তাই আমরা শুধু উপভোগ করে গিয়েছি প্রকৃতি আর মানুষের যৌথ প্রযোজনা।

২৮ অক্টোবর ছিল ভারত সরকারের নিমন্ত্রণে ৮ দিনের সফরের শেষদিন। এদিন আমরা ছিলাম কলকাতায়। বিমানবন্দর থেকে সবাই ছুট লাগালাম নিজেদের পছন্দমত গন্তব্যে। কেউ হাওড়া ব্রিজ তো কেউ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। সন্ধ্যায় এয়ারপোর্টে ফিরে ডিলেড ফ্লাইটের কল্যাণে ইমিগ্রেশন মাতিয়ে তুললাম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভিন্ন মানসিকতার একশো তরুণ এক হয়েছিল আটদিনের জন্য। প্রাণভরে দেখেছে সুন্দরের বিচরণ, জেনেছে ইতিহাস আর ভারতকে জানিয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির নানা দিকের খতিয়ান। ভাগ করে নিয়েছে সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পুরনো খতিয়ান। সংস্কৃতি আদানপ্রদানের এ ধারা দুই দেশের বন্ধুত্বকে জোরাল করবে, সন্দেহ নেই। আর ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাকর্মচারীদের ধন্যবাদ দিতেই হয়। কেন্না পুরো আয়োজন তাঁরা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

জিনাত জোয়ার্দার রিপা সংবাদকর্মী

বিজ্ঞান

আকাশের ঠিকানায় ভারতের মহাকাশপ্রযুক্তি

পল্লব বাগলা

অনেকেই হয়তো জানেন না, ভারত আজ মহাকাশে তার সামর্থ্যের শেষবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে; দেশ তার নিজস্ব বিশালাকার রকেট নির্মাণ ও উৎক্ষেপণ করেছে; অত্যন্ত উন্নতমানের কৃত্রিম উপগ্রহের নকশা ও সংযোজনের কাজ করেছে। একক অর্জন, ভারতের মঙ্গল আর্বিটার মিশন বা মঙ্গলায়ন, মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান আজ রক্তিম গ্রহের সঙ্গে রদেভুঁ করতে ছুটছে। আর এর মধ্য দিয়ে ভারত ঢুকে গেল সেই 'নির্বাচিত ৬' ক্লাবে যারা ৬৮ কোটি কিলোমিটার পাড়ি দেবার সাহস রাখে।

২০০৯ সালে ভারতের প্রথম চন্দ্রাভিযান 'চন্দ্রায়ন্ন ১' শুষ্ক চন্দ্রপৃষ্ঠে জলের উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ হাজির করেছিল। আরো বাস্তবসম্মত অভিযাত্রায় ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ভারতের প্রান্তিক ও দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জন্য ভূগর্ভস্থ জলস্তর সন্ধানেও সাহায্য করছে। সেভাবে বলতে গেলে, ভারতের মহাকাশ প্রযুক্তি প্রত্যেককেই সাহায্য করছে।

কক্ষপথে ১০টি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর মাধ্যমে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহের মধ্যে ভারতের মহাকাশ যোগাযোগ্ন উপগ্রহবহর বৃহত্তম। অন্তত ডজনখানেক দূর্ন্ন নিয়ন্ত্রিত উড্ডীন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে নয়াদিল্লি পৃথিবীর আকাশের নাগরিক্ন চোখের বৃহত্তম গতায়াত নিয়ন্ত্রণ করছে। এইসব যান্ত্রিক বিহঙ্গের কয়েকটি আকাশ থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরের গাড়ির মত ছোট ছোট বস্তু দেখতে পারে, কয়েকটির আবার দিন্ন রাত্রির দেখার ক্ষমতা আছে, বিশ্বের যে কোন স্থানের ছবি পাঠাতে পারে। অতি সাম্প্রতিকালে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর ভারতের 'রিসোর্সস্যাট' কৃত্রিম উপগ্রহের আহরিত উপাত্ত ব্যবহার করে আমেরিকার কৃষিখামারসমূহের ফসল উৎপাদন পরিমাপ করছে।

দেশের সকল মহাকাশ্ন প্রযুক্তির জিম্মাদার ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (আইএসআর ও– ইসরো) র গবেষণাকাজে ভারত এখন বছরে একশো কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার বর্তমান কর্মীসংখ্যা ১৬ হাজার। ভারত চেন্নাইয়ের ৮০ কিলোমিটার উত্তরে বঙ্গোপাসাগর তীরবর্তী শ্রীহরিকোটায় অবস্থিত উচ্চ্ন প্রযুক্তির মহাকাশ বন্দর থেকে তার রকেটসমূহ উৎক্ষেপ করে। জোড্ডা উৎক্ষেপমঞ্চ থেকে এ পর্যন্ত্ব ৪০টি রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। ইসরো র বহুমুখী কর্মতৎপর রকেট পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (পিএসএলভি) এর ২৪টি পৌনঃপুনিক সফল উৎক্ষেপণের ঈর্ষণীয় রেকর্ড রয়েছে। এর সর্বোচ্চ ভারী ৩২০ টন (একটি পুরো ভর্তি ৭৪৭ বোয়িং জাম্বো জেটের ওজনের সমান) ওজন ও ৪৪ মিটার (প্রায় পনের তলা ভবনের সমান) উচ্চতাবিশিষ্ট রকেটটি দেড়টন কৃত্রিম উপগ্রহ বহন করে জিও সিনক্রোনাস ট্রান্সফার কক্ষপথে এবং ৩ টন বহন করে পৃথিবীর নিকটবর্তী কক্ষপথে নিয়ে যেতে পারে। ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর এই রকেটটিই ভারতের প্রথম মঙ্গল অভিযানের জন্য উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। পিএসএলভি উৎক্ষেপকটি ইতালীয়, ইসরাইলী ও ফরাসিরা তাদের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করেছে। ভারত এপর্যন্ত তার মাটি থেকে মোট ৩৫টি বিদেশী কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে।

বিরাট উল্ল ক্ষ সত্ত্বেও ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি শুরু হয়েছিল খুবই সাদামাটাভাবে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কেরালার আরব সাগর তীরবর্তী ছোট্ট জেলেগ্রাম থুম্মা র সেন্ট মেরি ম্যাগডালেনস্ গির্জার অভ্যন্তরে। অর্দ্ধ শতাব্দী আগে ১৯৬৩ সালের ২১ নভেম্বর দেশের প্রথম রকেটটি যখন উৎক্ষেপিত হয়েছিল, তখন ১৮০কিলোমিটার দূরে বায়ুমণ্ডলে আমেরিকার তৈরি একটি ছোট নাইক অ্যাপাচে রকেটকে সন্ধ্যাকাশে দেখা যেত। মহাকাশ গবেষণা প্রসঙ্গে ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির জনক কিংবদন্তি পদার্থবিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই একদা বলেছিলেন, 'অনেকে আছেন যাঁরা উন্নয়নশীল দেশের মহাকাশ কর্মকাণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়তার কোন বিকল্প নেই। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশসমূহের চন্দ্রাভিযান বা গ্রহাভিযান বা মনুষ্যবাহী মহাকাশযানে ভ্রমণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার অলীক কল্পনা আমাদের নেই। তবে এটা বুঝেছি যে, আমরা যদি জাতীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারি, আমরা অবশ্যই

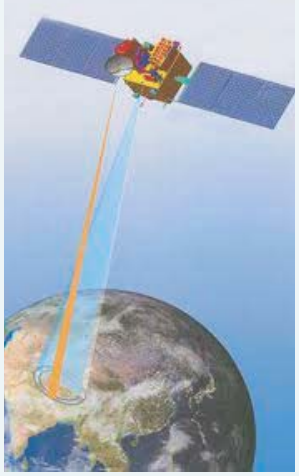

মানুষ ও সমাজের সত্যিকার সমস্যায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে অদ্বিতীয় হয়ে উঠব।'

সেই আদর্শ মেনে ইসরো আজ এর চৌকস মহাকাশ প্রযুক্তির সাহায্যে বিপুল ভারতীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণব্রতে জোর দিয়েছে এবং মহাকাশভিত্তিক প্রয়োগক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জেলেরা মহাকাশ বিভাগের বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করছেন যা মহাসমুদ্রে মাৎস্য এলাকা নির্ণয়ে তাদের সাহায্য করছে। ভারতের 'ওশনস্যাট' কৃত্রিম উপগ্রহ এ প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জেলেদের সহায়তা দিচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহারের মাধ্যমে আকাশ থেকে ভারতের বন ও ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চলের মানচিত্র তৈরি হচ্ছে এবং এভাবে বন্য প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা হচ্ছে। ভারতের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগে যথাসময়ে সর্বশেষ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় বা হ্যারিকেনের হাত থেকে হাজার হাজার মানুষের প্রাণরক্ষায় সাহায্য করেছে।

ক্রমপ্রসারমান সফট্ওয়্যার শিল্পের মাধ্যমে ভারত আজ বিশ্বের তথ্য প্রযুক্তি রাজধানী হিসেবে পরিচিত এবং এটা কখনই সম্ভব হত না, যদি না যথাসময়ে বোস্টন ও অন্যান্য সফট্ওয়্যার নাভিকেন্দ্রের সঙ্গে বাঙ্গালোরকে সংযুক্ত করা যেত। কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক যোগসূত্রের ওপর বিকাশমান দেশীয় মিডিয়া ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছে। ভারতের যোগাযোগ উপগ্রহ পাঁচ শতাধিক বিনোদন ও বেসরকারি সংবাদ টেলিভিশন চ্যানেল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এবং এভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের একশো একুশ কোটি মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করছে। মহাকাশভিত্তিক ট্রান্সপন্ডারদের এত চাহিদা যে, ইসরো চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছে না এবং বিদেশী ভেন্ডারদের কাছে থেকে স্পেস ভাড়া নিতে বাধ্য হচ্ছে।

২০১৩ সালের জুলাইয়ে ইসরো কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহারের আরেকটি ক্ষেত্র স্যাটেলাইট নেভিগেশন্ এ হানা দিয়েছে। ভারতের আঞ্চলিক নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম্ এর প্রথম উপগ্রহ আইআরএনএসএস্ ওয়ানএ (IRNSS-1A) দেশেই তৈরি হয়েছে এবং পিএসএলভি্ র মাধ্যমে সফলভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেলে এটি আমেরিকান গ্লোবাল পজিশানিং সিস্টেমকে সৌজন্য হিসেবে দেওয়া হবে যাতে মোবাইল ডিভাইসে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকেই এর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

কোন কিছুই যাদু দিয়ে হয় না; ইসরো ভারতের অপেক্ষাকৃত ভারী রকেট জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (জিএসএলভি্) এর উৎক্ষেপণ্ন কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে, ২০১০ সালে এক্ষেত্রে বড় ধরনের ব্যর্থতা সইতে হয়েছিল। এই রকেট আড়াইটন ওজনের যোগাযোগ উপগ্রহ উত্তোলন করতে পারে এবং এর উন্নত সংস্করণ হবে সেই ঈপ্সিত রকেট যা ভারতের মাটি থেকে ভারতীয় রকেট ব্যবহার করে ভারতীয়রাই মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করবে।

আন্তঃগ্রহ উল্লম্ফন

এক সুরভিত বিকেলে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (পিএসএলভি) উৎক্ষেপণের মাধ্যমে রক্তিম গ্রহে ভারতের যাত্রা শুরু হয়, আকাশে সেই হল ভারতের পথনির্দেশ। মঙ্গলের পথে ১৩৪০ কিলোগ্রাম ওজনের ছোট মহাকাশযানের পিঠে চেপে চলেছে ভারতের ১০০ কোটির অধিক মানুষের স্বপ্ন। ভারতের মঙ্গলাভিমুখী মহাকাশ মিশন জাতীয় গর্বে পরিণত হয়েছে এবং এশিয়ায় প্রথম দেশ হিসেবে মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশের একান্ত ইচ্ছা ফলবতী হল।

ইসরো একে মারস্ অরবিটার মিশন হিসেবে আখ্যায়িত করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। মনুষ্যবিহীন এই মহাকাশযানটি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণা, নকশা ও নির্মাণের স্বাক্ষর। ভারতের এই প্রথম মঙ্গল মিশনের খরচ প্রায় ৭০ কোটি ডলার এবং সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে মাত্র ১৫ মাসে ৫০০বিজ্ঞানীর নিরলস শ্রমে এটি ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এটি কম খরচ নিঃসন্দেহে। ইসরোর চেয়ারম্যান কে রাধাকৃষ্ণাণ ভারতের মঙ্গলাভিযানকে সত্যিকারের 'প্রযুক্তি প্রদর্শক' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যার মাধ্যমে ভারত যে 'আন্তঃগ্রহ উল্ল ম্ফা' দিতে পারে, সেটা জগতবাসীকে দেখানো গেল। এপর্যন্ত জাপান, চিন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা মঙ্গলাভিযানের চেষ্টা করেছে– এদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি দেশ সফল হয়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫০টি মিশন পরিচালিত হয়েছে, যার প্রায় এক্ক তৃতীয়াংশ হয়েছে ব্যর্থ। মঙ্গলাভিযানের সর্বশেষ ব্যর্থতা চিনের, ২০১১ সালে। ভারতের মঙ্গল অভিযাত্রা সফল হলে সেটি হবে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পর বিশ্বের তৃতীয় একক দেশ। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থাও মঙ্গলে পৌঁছতে পেরেছে।

সুতরাং এটি একটি দেশের বিশাল উল্ল ম্ফা অথবা বোকার কষ্টসাধ্য পদক্ষেপ ক্কি না, সে বিবেচনা আপনার। তবে এ ব্যাপারে সবাই নিঃসন্দেহ যে, *মঙ্গলায়ন* এখনও পর্যন্ত য়ে কোন দেশের গৃহীত আন্তঃগ্রহ অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচের এবং এটি স্বল্প খরচে মঙ্গলাভিযানের পথ সুগম করেছে।

ভারত ইতোমধ্যে তার দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনা করেছে, যা সম্ভবত চন্দ্রপৃষ্ঠে ভারতের নিজস্ব রোভারের (Rover) অবতরণ; সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য 'আদিত্য' নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মিত হচ্ছে এবং ইসরো ইতোমধ্যে একটি ভ্রাম্যমাণ উপগ্রহে ভ্রমণের চিন্তাভাবনা করছে।

ভারত পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যবাহী মহাকাশযান উড্ডয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করেছে যাতে ভারতীয় মহাকাশ প্রযুক্তিবিদেরা মহাকাশের কক্ষপথে একজন নভোচারী পাঠাতে পারেন। এখনও পর্যন্ত ভারতের চন্দ্র কিংবা মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর কোন পরিকল্পনা নেই। তবে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সাম্প্রতিক অগ্রগতি এই যে, ভারতীয় ও মার্কিন মহাকাশ সংস্থা যৌথভাবে একটি রাডার স্যাটেলাইট নির্মাণের সক্রিয় চিন্তা ভাবনা করছে যা আবহাওয়া পরিবর্তন ও সমুদ্রতল বৃদ্ধির সমীক্ষায় সাহায্য করবে।

ইসরোর চেয়ারম্যান কে রাধাকৃষ্ণাণ বলেন, 'আমরা দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করা থেকে ভারতকে সরে আসতে বলব না', তবু তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, 'চন্দ্রে জলের সন্ধানের পর ও মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব সন্ধানের জন্য এই মঙ্গলাভিযানের প্রয়োজনীয়তা ঐতিহাসিক। ভারত এখন মহাকাশে সর্বৈব প্রযুক্তিগত শক্তি নিয়ে আন্তঃগ্রহ পরিভ্রমণ কর্মসূচি গ্রহণের সামর্থ্য প্রদর্শন করছে।'

পল্লব বাগলা ভারতের বিজ্ঞান লেখক

জীবাণু থেকে সুরক্ষায়
ডেটল গোসল প্রতিদিন!

Dettol

BE 100% SURE

বেছে নিন আপনার পছন্দের ডেটল সাবান

PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS ASSOCIATION BANGLADESH ESTD 1977
*BPMPA

ডাক্তারদের দ্বারা স্বীকৃত
বাংলাদেশের একমাত্র সাবান

www.dettol.com.bd
facebook.com/dettolbd

প্রতিবেশ

ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন

ড. নিশীথকুমার পাল

হাওড়ায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন, বর্তমানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন ইতোমধ্যে ২২৫ বছর অতিক্রম করেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে ১৭৮৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন একে বলা হত 'কোম্পানি বাগান'। ১৮৫৭ সালে যখন মহারানি ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন, এর নামকরণ হয় রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৫০ সালে এর নাম হয় ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন। সাধারণ লোকের কাছে অবশ্য বোটানিক্যাল গার্ডেন নামেই পরিচিত। কলকাতায় ব্রিটিশ শাসনের একটি অন্যতম আশ্চর্যজনক অবশিষ্টাংশ হল ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন, যা এই নগরীর পুরনো ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় এবং এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম বোটানিক্যাল গার্ডেনের অন্যতম। কেবলমাত্র ইংল্যান্ডের কিউ-এ অবস্থিত রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডেলিডের বোটানিক্যাল গার্ডেন এর সমসাময়িক।

হুগলি নদীর পাড়ে প্রায় ২৭৩ একর জায়গা নিয়ে ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত। শুরুতে এই উদ্যানের মোট জায়গা ছিল ৩১৩ একর। কিন্তু ১৮২০ সালে উদ্যানের পূর্বের ৪০ একর জমি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কলকাতার বিশপকে দান করা হয়। এই কলেজের নাম ছিল বিশপ কলেজ, যা পরবর্তীকালে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়।

১৭৮৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লেফটেনেন্ট কর্নেল রবার্ট কিড ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের মিলিটারি বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন কিড। তখন তাঁকে এই উদ্যানের অবৈতনিক সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

এর প্রতিষ্ঠায় শুধুমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই অর্থ দেয়নি, কিড তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকেও অর্থ দিয়েছেন।

ক্যালকাটা জুওলজিক্যাল গার্ডেনের প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট এবং বিখ্যাত *হ্যান্ডবুক অফ ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যানিমালস ইন ক্যাপটিভিটি ইন লোয়ার বেঙ্গল*এর লেখক রামব্রহ্ম সান্যাল 'আওয়ার্স উইথ নেচার' (১৮৯৬) শিরোনামে একটি পুরো অধ্যায় ব্যয় করেন ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেনের (তখনকার রয়্যাল বোটনিক্যাল গার্ডেন) ইতিহাস বর্ণনা করতে। তিনি উলেখ করেন তাঁর এই অধ্যায়ের ভিত্তি হল বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রখ্যাত সুপারিনটেনডেন্ট ড. জর্জ কিং প্রণীত *গাইড টু রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন*, শিবপুর (১৮৯৫)। ড. কিং ছিলেন বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতাপরিচালক।

রবার্ট কিড ছিলেন একজন উদ্যমী উদ্যানতত্ত্ববিদ। হাওড়ার শালিমারে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যানে অনেকগুলি বিদেশি উদ্ভিদ লাগিয়েছিলেন তিনি। তখন থেকেই একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করার কথা তাঁর মাথায় আসে। বোর্ড অফ ডিরেকটর তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং উপযুক্তভাবেই তাঁকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রথম অবৈতনিক সুপরিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ দেয়। কিড জায়ফল, লবঙ্গ ও গোলমরিচের গাছ প্রবর্তন করেন। তবে বাংলার আবহাওয়া এগুলির বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ছিল না। তিনি কিছু গ্রীষ্মম-লীয় ও নাতিশীতোষ্ণ ফলের গাছ লাগান, কিন্তু সেগুলিও ব্যর্থ হয়। তিনি কিছু সেগুন গাছও লাগান। তখনকার দিনে জাহাজ তৈরির কাজে এটি ছিল মূল্যবান কাঠ। রবার্ট কিড ১৭৯৩ সালের ২৬ মে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর উইলে (ইচ্ছাপত্র) শালিমার গার্ডেনের অ্যাভোকাডো পেয়ার বৃক্ষের নিচে তাঁকে সমাধিস্থ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তাঁর ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে কলকাতার সাউথ পার্ক স্ট্রিট সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়।

ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক উইলিয়াম রক্সবার্গের অবদান ছাড়া ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারত না। তিনি ছিলেন এই উদ্যানের প্রথম বৈতনিক (বেতনভুক) সুপারিনটেনডেন্ট। তিনিই ছিলেন প্রথম উদ্ভিদবিজ্ঞানী যিনি ভারতীয় উদ্ভিদরাজির একটি প্রণালীবদ্ধ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি এই উদ্যান এবং কলকাতার আশেপাশে জন্মানো দেশি ও বিদেশি উদ্ভিদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৭২ সালের আগে পর্যন্ত রক্সবার্গের *ফ্লোরা ইন্ডিকা* ছিল একমাত্র বই, যার সাহায্যে ভারতীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যেত। প্রখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী এবং ইংল্যান্ডের কিউ উদ্যানের পরিচালক স্যার জোসেফ হুকার ১৮৭২ সালে সাত খণ্ডে *ফ্লোরা অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* প্রকাশ করেন।

উদ্যানে মেহগনির মত উচ্চমানের কাষ্ঠউৎপাদী উদ্ভিদ প্রবর্তনের কৃতিত্ব রক্সবার্গের। এই বৃক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে এনে ১৭৯৫ সালে লাগানো হয়। এখনও উদ্যানে মেহগনির অ্যাভিনিউ আছে। রক্সবার্গই ভারতে আধুনিক উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাসের (লিনিয়াস পরবর্তী) ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৭৯৫ সালে তিনি একটি বৃহৎ হার্বেরিয়াম (যে স্থানে উদ্ভিদের শুকনো নমুনা সংরক্ষণ করা হয়) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম নামে পরিচিত। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ও বড় হার্বেরিয়াম। বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুসারে এতে ৩৫০টি পুষ্পক উদ্ভিদগোত্রের প্রায় আড়াই মিলিয়ন হার্বেরিয়াম শিট আছে। ভগ্ন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রক্সবার্গ এডিনবরা যান, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই উদ্যান বিখ্যাত হওয়ার পিছনে আরেক উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ড. জর্জ কিংএর অবদান আ ছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে উদ্যানটিকে ২৫টি সেকশনে ভাগ করে প্রতিটিতে নির্দিষ্ট প্রকারের উদ্ভিদ লাগানো হয়। একটি কনজারভেটরিও তৈরি করা হয়। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কিং ভারতে রাবার চাষের প্রবর্তন করেন। ১৮৭৩ সালে কিউ উদ্যানের স্যার রবার্ট হুকের কাছ থেকে তিনি ছয়টি প্যারা রাবার গাছের (হিভিয়া ব্রাজিলেনসিস) চারা নিয়ে আসেন। ১৮৮২ সালে ড. কিংএর পরাম র্শে একটি নতুন হার্বেরিয়াম বিল্ডিং তৈরি করা হয় এবং বেন্থাম ও হুকারের উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে হার্বেরিয়ামে উদ্ভিদ নমুনাগুলি সাজানো হয়।

চা, রাবার, পাট, সিনকোনা, আখ, মেহগনির মত অনেকগুলি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রবর্তন করে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৮২৩ সালে উত্তরপূর্ব ভারত থেকে রবার্ট ব্রুস চা গাছ আবিষ্কার করেন এবং ১৮৩৪ সালে এই উদ্যানে ফ্রান্সিস জেনকিনস্এর ব্যাপক ট্রায়ালের পরই ভারতে চাচা ষের প্রবর্তন হয়। একইভাবে, এই উদ্যানের তদানীন্তন সুপারিনটেনডেন্ট টমাস অ্যান্ডারসনএর ট্রায়ালের পর ১৮৬২ সালে সিকিম ও দার্জিলিং পাহাড়ে সিনকোনার চাষ শুরু হয়। সিনকোনার বীজ আনা হয় কিউএর রয় াল বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে।

এই প্রাচীন উদ্যানের অতীতের এক জীবন্ত সাক্ষি হল বৃহৎ বটবৃক্ষ। এই বটবৃক্ষ উদ্যান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অনেক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটি উদ্যানের চেয়েও পুরনো। এর বয়স ২৫৫ বছর বলে অনুমান করা হয়। ১৮১০ সালের নভেম্বরে মেরিয়া গ্রাহাম (এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রফেসর রবার্ট গ্রাহামের বোন) এই উদ্যান পরিদর্শন করে রঙিন পরাশ্রয়ী গাছপালাসহ এই বৃহৎ বটবৃক্ষটি দেখে দারুণভাবে অভিভূত হন। এই বৃক্ষের ২৮০০টির বেশি ঝুরি আছে এবং প্রায় দেড় একর জায়গা দখল করে আছে। এর ক্যানোপির ব্যাস প্রায় ৪৫০ মিটার এবং দেখতে ছোটখাটো একটা বনের মত। ১৮৬৪ এবং ১৮৬৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এই বৃক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ১৯২৫ সালে ছত্রাকের সংক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত ১৬ মিটার বেড়ের প্রধান গুঁড়িটি অপসারণ করা হয়।

এছাড়া, এখানে আছে বিভিন্ন রকমের দুষ্প্রাপ্য, বিপন্ন ও অদ্ভুত ধরনের দেশিবি দেশি উদ্ভিদের সংগ্রহ। সাম্প্রতিককালে উদ্যান কর্তৃপক্ষ এখানকার উদ্ভিদের একটি তালিকা তৈরি করেছে। এই তালিকা অনুসারে এখানে ১২০০প্রজাতির বৃক্ষ এবং ১৪,০০০প্রজাতির বিভিন্ন

উদ্ভিদ আছে। এদের মধ্যে ৫০০প্রজাতি দুষ্প্রাপ্য। বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া একটি গাইড প্রকাশ করেছে। এতে বাঁশ, পাম, অর্কিড, ক্যাকটাস, স্ক্রু পাইন, জেসমিন, বোগেনভিলিয়া, লেগুম, ওয়াটার লিলি ইত্যাদির উলেখ আছে। উদ্যানের ন্যাশনাল অর্কিডেরিয়াম অংশে, ২০০০ প্রকারেরও বেশি দেশিবি দেশি অর্কিড আছে। এদের মধ্যে এরিডিস, ক্যাটলিয়া, সিম্বিডিয়াম, কোয়লোগাইন, এরিয়া, ভ্যান্ডা, ভ্যানিলা, ডেন্ড্রোবিয়াম, এপিডেনড্রাম, ইউলোফিয়া, বালবোফাইলাম, ফেয়াস, ফোলিডোটা, রেনানথেরা, রিনকোস্টিস ইত্যাদি উলেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা ২৬ প্রজাতির বেশি বাঁশ আছে এখানে। এদের কতকগুলি দেখতে খুব সুন্দর। যেমন বুদ্ধের বাঁশ বা বুদ্ধ বেলি বাঁশ, হলুদ বাঁশ, সোনালি বাঁশ, জায়ান্ট বাঁশ ইত্যাদি।

এই উদ্যানে আছে ১৪০টির বেশি বোগেনভিলিয়ার কাল্টিভার। এগুলি আবার বোগেনভিলা গ্লাবরা এবং বোগেনভিলা স্পেকটাবিলিস নামে দু'টি প্রজাতির অন্তর্গত। কয়েকটি কাল্টিভারের নাম 'মহাত্মা গান্ধী', 'লেডি মাউন্টব্যাটেন', 'মহারাজা অফ মাইসোর', 'লেডি মেরি বেরিং', 'মেরি পালমার স্পেশাল', 'লেডি হোপ', 'মিলিয়ন ডলার', 'গোল্ডেন গো', 'সুইট হার্ট', 'স্প্রিং ফেস্টিভাল', 'সামার টাইম', 'স্কারলেট গো'।

দেশি ও বিদেশি পাম জাতীয় উদ্ভিদের জন্য এই উদ্যান বিখ্যাত। এখানে আছে পামের ১০৯টি প্রজাতি, যা দক্ষিণ পূর্বএশিয়ায় সব চেয়ে সমৃদ্ধ সংগ্রহ। এখানে আছে মিশর ও পূর্বআফ্রিকার শাখান্বিত পাম, এর কাণ্ড থেকে দৃষ্টিনন্দন দ্বাগ্র শাখা বের হয়। আরেকটি খুবই দুষ্প্রাপ্য পাম হল, ডাবল কোকোনাট পাম (লোডোইসিয়া মালডিভিকা)। উদ্ভিদজগতের সবচেয়ে বড় বীজ এই পামের। এর জীবনকাল প্রায় ১২০০ বছর। এই বৃক্ষের লিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষ নাকি স্ত্রী, নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন হয় প্রায় ১০০ বছরের। এই উদ্যানের ডাবল কোকোনাট পাম উদ্ভিদটি স্ত্রীউদ্ভিদ এবং ১৮৯৪ সাল থেকে এটি আছে। উদ্যান কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন শ্রীলংকার একটি পুরুষ গাছের পরাগরেণু এনে এই স্ত্রী-উদ্ভিদের ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে বীজ উৎপাদনের।

এখানকার আরেকটি দুষ্প্রাপ্য পাম হল সেঞ্চুরি পাম (কোরিফা ইলাটা)। এটি জীবনকালে একবারই বীজ উৎপাদন করে মারা যায়। স্ত্রী উদ্ভিদের বয়স ৭৫ থেকে ১০০ বছর হলে এর শীর্ষে একটি ঘন পুষ্পমঞ্জরি তৈরি হয়। যখন এর বীজ পরিপক্ব হয়, তখন এর সমস্ত পাতা ঝরে যায়। কেবলমাত্র একটি লম্বা পাতাবিহীন গুঁড়ি থাকে, আর এর মাথায় থাকে হাজার হাজার বীজ। পাকা বীজ গাছ থেকে ঝরে পড়ে এবং ধীরে ধীরে গাছটি শুকিয়ে মরা যায়।

ওয়াটার লিলির একটি খুব ভাল সংগ্রহ আছে এই উদ্যানে। এগুলি ইউরায়ালেসি, নিলাম্বোলেসি এবং নিমফিয়েসি গোত্রের অন্তর্গত। একটি আকর্ষণীয় লিলি হল 'আমাজন ওয়াটার লিলি' (ভিকটোরিয়া আমাজোনিকা)। জুন থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এদের দেখা যায়। এদের পাতার ব্যাস ১.৭৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই পাতা এত শক্তিশালী যে, ১২১৬ বছ রের কিশোরকি শোরীর ওজন বহন করতে সক্ষম। এই উদ্যানের হ্রদে জন্মানো আরেকটি অদ্ভুতদর্শন উদ্ভিদ হল মাখনা (ইউরাইলি ফেরক্স)। এই উদ্ভিদের ভোজ্য ভাজা বীজ বাজারে 'তাল মাখনা' হিসেবে বিক্রি হয়।

ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেনে বিপুলসংখ্যক ক্যাকটাস আছে। এই ক্যাকটাস ও রসালো উদ্ভিদ বিশেষভাবে তৈরি একটি গাস হাউসে রাখা আছে। দশটি গোত্রের অন্তর্গত ১০০টিরও বেশি প্রজাতির ক্যাকটাস ও রসালো উদ্ভিদ আছে, যার মধ্যে কতগুলি দুষ্প্রাপ্য। এখানে কতকগুলি লেগুম জাতীয় উদ্ভিদ আছে। এদের অনেকগুলির ফুল অত্যন্ত সুন্দর, অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, দুষ্প্রাপ্য ও বিপন্ন। একটি উলেখযোগ্য উদ্ভিদ হল, 'কুইন অফ ফ্ল্যাওয়ারিং ট্রিস' বা 'ট্রিস অফ হেভেন' (অ্যামহারস্টিয়া নোবলিস)। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ফুলের একটি।

এই উদ্যানে কতকগুলি অদ্ভুত উদ্ভিদ আছে। যেমন 'ক্যানন বল' (কুরুপিটা গুইয়ানসেসিস), 'ব্রেড ফ্রুট' (আর্টোকার্পাস কমিউনিস), 'ম্যাড বৃক্ষ' (টেরিগোটা অ্যালাটা), 'কোকেইন উদ্ভিদ' (এরিথ্রোজাইলন কোকো), 'পাউডার পাফ' (ক্যালিয়্যানড্রা হেমাটোসেফালা) এবং 'সসেজ বৃক্ষ' (কিগোলিয়া পিনাটা)। ক্যানন বল বৃক্ষের ফল দেখতে কামানের গোলার মত। ব্রেড ফ্রুটের ফলে যথেষ্ট পরিমাণে স্টার্চ আছে এবং বেক করলে রুটির মত গন্ধ বেরোয়। ম্যাড ট্রি বা পাগলা গাছের বৈশিষ্ট্য হল এর প্রতিটির পাতার আকারআয়তন ভিন্ন, ভিন্ন প্রকৃতির। নেশাজাতীয় দ্রব্য কোকেইনের উৎস হল কোকেইন উদ্ভিদ। পাউডার পাফ ঝাঁকড়া গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, এর গাঢ় লাল রঙের ফুলের গুচ্ছ দেখতে পাউডারের পাফের মত। সসেজ বৃক্ষের বড় সসেজ বা লাউএর আকৃতির ফল লম্বা বোঁটায় ঝুলে থাকে। তাই এই উদ্ভিদটি দেখতে অদ্ভুত লাগে।

এই উদ্যানে ভেষজ উদ্ভিদের ভাল সংগ্রহ আছে। প্রাচীন চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তক চরক সংহিতায় উলেখিত ভেষজ উদ্ভিদের কতগুলি চরক উদ্যান নামে একটি ছোট বাগানে রাখা আছে।

ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেনে কেবলমাত্র উদ্ভিদই নেই। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিও দেখা যায়। কয়েক প্রজাতির সাপ ও প্রজাপতিও এখানে আছে।

এই উদ্যানে দর্শকদের ঘোরাফেরার জন্য ব্যাটারিচালিত বাসের ব্যবস্থা আছে। এর চত্বরে বাস ও মোটর গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংগীতের ব্যবস্থা ছিল এবং ক্রিসমাসের সময় সবচেয়ে ভাল মালিকে পুরস্কৃত করা হত।

যদিও ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেনের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনা যাবে না, তবে যাঁরা এখানে আসেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন যে, শহরের কোলাহল থেকে দূরে এটি হল সবুজ গাছপালার একটি ভিন্ন জগত।

ড. নিশীথকুমার পাল
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

দুই.

জয়নুল মিয়ার বাড়িতে আজ উৎসব। খবরটা শিউলিই সবাইকে দিয়েছে। যে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ও চাকরি করে সে স্কুলের হেড মিসট্রেসের দায়িত্ব পেয়েছে ও। আগের হেড মাস্টার অন্য স্কুলে বদলি হয়ে গেছেন। এই উৎসব জয়নুল মিয়া প্রাণভরে উপভোগ করে। ভাবে, এমন একটি উৎসব ভাগ্যে পাওয়া অনেক বড় পাওয়া। আল্লাহ মেহেরবান। জয়নুল মিয়ার চোখে পানি আসতে চায়। কিন্তু নিজেকে সংযত রাখতে খুব কষ্ট হয় তার। তারপরও কষ্ট শক্তভাবে চেপে রেখে নিজেকে বুঝিয়ে বলে, আজ আনন্দ।

একটু আগে শিউলি তাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলেছে, আব্বা দোয়া করেন।

বড় হও মা। অনেক কাজ কর। স্কুলের মান রক্ষা কর।

শিউলি চোখ মুছতে মুছতে বলে, আম্মা বাড়িতে থাকলে আমার পড়ালেখা বন্ধ

হয়ে যেত না। আমি বিএ পাশ করলে হাই স্কুলে চাকরি পেতাম।

যা পেয়েছ তার জন্য আলস্নাহর কাছে শোকর কর মা।

শিউলি কথা বাড়ায় না। উঠোনে চার বোন হাত ধরাধরি করে লাফালাফি করছে। আনন্দ প্রকাশের ভাষায় কত ধরনের শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে, হাসির রকমফের হচ্ছে, অঙ্গভঙ্গিও ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে– জয়নুল মিয়া আবার ভাবে এমন দৃশ্য দেখার ভাগ্য তার ছিল। এ দৃশ্য না দেখে বয়স বাড়তে থাকলে মনে হত বেঁচে থাকা ঠিকমত হল না। বেঁচে থাকা মজা পুকুরের মত আস্তে আস্তে বুজে যেত। এই মেয়েরা তার জীবনকে এই মজা পুকুর হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

পদ্ম চেঁচিয়ে বলে, বাজান আপনিও আসেন আমাদের হাত ধরেন। আসেন বাজান। আপনার ভাল লাগবে। দেখবেন অনেক মজা।

জয়নুল মিয়া লজ্জা পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। শিউলি তার হাত ধরে বলে, আসেন বাজান। আনন্দ করলে মন ভাল থাকে।

শিউলি বাবাকে হাত ধরে টানে। জয়নুল এগিয়ে মেয়েদের হাত ধরে। ওদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। হাসে। উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশে নিজেই অবাক হয়। কত বছর ধরে এত আনন্দ জমা ছিল বুকের ভেতরে তা এমন করে টের পাওয়া হয়নি। রাশিদুনের সঙ্গেও এক ধরনের আনন্দের সময় ছিল। বিয়ের প্রথম দিকে। রাত জেগে গল্প করলেও মনে হত রাত ফুরোয়নি। সকাল হবে কেন, সকাল হওয়ার কথা নয়। ওর আর রাশিদুনের এখন এক হাজার রজনী পার করার সময়। তবেই তো সকাল হবে। তারপর একদিন সেই আনন্দ উবে গেছে। মজা পুকুরের নিচে অনবরত তলিয়েছে সময়। এখন ভেবেছিল এই অবস্থাই জীবনের নিয়তি। এখন মনে হচ্ছে ওই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসা সহজ করে দিয়েছে মেয়েরা। আশ্চর্য এক রূপকথার মত ওর জীবন। একসময় হাঁফিয়ে গিয়ে জয়নুল বলে, আর যে পারি না মায়েরা।

আপনি বারান্দায় বসেন বাজান। আমি পাশের ঘরের লতীফকে বাজারে পাঠাব, জিলাপি নিয়ে আসবে। আজ রাতে সবাইকে পাটালি গুড় আর দুধ্ল ভাত খেতে দিব। অন্যরকম হবে না বাজান?

হ্যাঁ, মা খুব ভাল হবে। রোজ রোজ ডাল ভাত কি ভাল লাগে? লতীফকে ডাকতে হবে না। আমিই বাজারে যাব। আমার বালিশের নিচে টাকা আছে দেখ।

আপনার টাকা লাগবে না। টাকা আমি দেব।

শিউলি আঁচলের খুঁট খুলে টাকা বের করে বাবাকে দেয়। ঘর থেকে জামা আর স্পঞ্জের স্যান্ডেল এনে দেয়। জয়নুল মিয়া রংজলা শার্টটা পরতে পরতে ভাবে, এই জামাটাও মেয়েটা কিনে দিয়েছিল। বছরখানেক আগে। রেডি হয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় চার মেয়ে দৌড়ে এসে ঘিরে ধরে বলে, বাজান আমরাও আপনার সঙ্গে যাব। জিলাপি কেনার সময় আপনার মনে যে খুশি হবে সে ভাগ আমরাও নেব।

চল, তাহলে। শিউলি কি একা বাড়িতে থাকবে?

বকুল চেঁচিয়ে বলে, শিউলিতো থাকবেই। সব খুশি তো ওর। ও একা একা থেকে খুশির আনন্দে মজে থাকুক। ওই ভাগ আমরা কেউ নেব না। যাই রে শিউলি বুবু।

শিউলি বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে এই একলা হয়ে যাওয়ায় ওর আনন্দ নেই। বোনদের লাফালাফি দেখে ওর বাবা বারান্দায় বসে বলেছিল, আমার মেয়েরা ওদের মায়ের মতই হয়েছে। আল্লাহ ওদের হাজার বছরের আয়ু দেক। মানুষের জীবনে হাজার বছরের আয়ু হয় না। কিন্তু আনন্দের জীবন হাজার বছরের আয়ুর সমান। মানুষ সেই জীবনেরই প্রার্থনা করে। ওর মায়ের জীবন থেকে কয়েকশো বছরের আয়ু ঝরে পড়েছে। ওর মা কি আর কখনো হাজার বছরের আয়ু পাবে? মনে হয় না। শিউলি নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়। ও কি করবে এখন? উঠোনের চারদিকে একপাক ঘুরে আসে। মাঝখানে দাঁড়ায়। স্যান্ডেল খুলে রেখে পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটে। গত বছরের এই দিনে বাবলা ওকে বলেছিল, শিউলি তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।

কি? আঁতকে উঠেছিল ও। কি বললেন?

কথাটা আমি একবারই বলেছি। বুঝতে পারনি?

দ্বিতীয়বার বলবেন না। আর কখনো বলবেন না।

রেগে গিয়েছিল শিউলি। এমন ধরনের কথা ওর জীবনের কোন ফুটো দিয়ে ঢুকতে পারবে না, এমন প্রতিজ্ঞাই তো আছে ওর। যেদিন মা চলে গেল সেদিন থেকে। এখন পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞায় ও অটলই আছে। কিন্তু এমন প্রতিজ্ঞা করা কি ঠিক হয়েছে? কাউকে না কাউকে তো জীবনের সঙ্গী করতে হবে। নইলে কেমন করে একা একা পাড়ি দেবে দীর্ঘ নদী? তরঙ্গসংকুল, পাড় ভাঙা নদীর ধ্বংসযজ্ঞ যেমন ছিন্নভিন্ন করে দু'পাড়, জীবন্ন নদীও তেমন। জীবনযাপন কি তছনছ হয় না? শিউলি ভীষণ মন খারাপ করে। একা জীবনযাপনের প্রতিজ্ঞা চিড় খায়। পুরো বাড়িতে কেউ নেই। ওর কি ভয় করছে? হ্যাঁ, তেমনইতো লাগছে। নিঃসঙ্গ বাড়ি এই সময় ওকে ব্যাপকভাবে ঝাঁকুনি দেয়। ও দু'হাত মুঠি করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বাবলাকে মনে করে। ওর চোখ্ল মুখ্ল নাক্ল শরীর, ওর দৃষ্টি অনুভব করে নিজের নিঃসঙ্গতা ভরিয়ে তুলতে চায় শিউলি। নিজের সঙ্গে এও এক ধরনের খেলা। নিঃসঙ্গতাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া। সেই দিনের পরে বাবলার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আগে কতইতো দেখা হয়েছে– মাত্র একটি প্রস্তাব– ভাল লাগার আকাঙ্ক্ষা উড়িয়ে নিয়ে গেল ছেলেটিকে। এখন ওকে স্মরণ করে বলে, তোমাকে খোঁজা আমার হবে না বাবলা। তুমি কোথায় আমি জানি না। তুমি তোমার মত থাক। ভাল থাক। তুমি কখনই জানবে না যে এই মুহূর্তে আমি তোমাকে আমার স্মরণে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার শূন্য জায়গা পূরণ করছি। এও বেঁচে থাকার নদী ভাঙন। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি সেখান থেকে আর ফিরে আসব না।

সেদিন তুমি বলেছিলে, আমার প্রতিজ্ঞার সিদ্ধান্ত একটা ভুল সিদ্ধান্ত। এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়।

আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, আমাকে উপদেশ দিও না। তুমি তোমার মত করে পথ দেখ। আমার ভুল সিদ্ধান্তই আমার ইচ্ছা।

তুমি বলেছিলে, আমি মনে রাখব তোমার ইচ্ছার কথা। তবে আমিও প্রতিজ্ঞা নিলাম যে একদিন এই বাড়িতে আসব। তোমার কোন একজন বোনের সঙ্গে রাত কাটাব। তুমি আমার জন্য রান্না করবে। যত্ন করে খেতে দেবে। দু'একদিন বেশি থাকার জন্য অনুরোধ করবে। আমি বলব, বুবু আজ যাই। আবার আসব।

সেদিন কৌতুকে তোমার চোখে ঝিলিক ছিল। তুমি আমার মুখের ওপর হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিলে, কাউকে ফিরিয়ে দিলে সেই আঘাত নিজেকেও সইতে হয়।

শিউলি সেদিন ওর সঙ্গে আর কথা বাড়ায়নি। চায়নি বিষয়টি জানাজানি হোক। ও জানে বাবলা ঢাকায় কোন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। শ্রমিক নয়, অফিসের কোন কাজ। ও খোঁজ নিয়ে জেনেছে সেদিনের পরে বাবলা আর গ্রামে থাকেনি। ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। বাবলাকে মনে রাখার চিন্তাও করেনি। বছর গড়িয়ে গেছে। বাবলা গ্রামে এসেছে কি আসেনি সে খবর রাখার প্রয়োজন মনে করেনি। আজ কেন মানুষটি তার সামনে এসে দাঁড়াল?

শিউলি নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খুব বিব্রত বোধ করে। ভাবে, এভাবে ভাবা ঠিক হয়নি। যে অধিকার মানুষটি তাকে দিতে চেয়েছিল সে অধিকার সে গ্রহণ করেনি। তাহলে কেন তাকে স্মরণে আঁকড়ে ধরে তার স্মৃতি সুখ উপভোগ করা? খুব খারাপ। শিউলি নিজেকে সামলায়। রান্নাঘরে যায়। কুলোয় চাল নিয়ে বাছতে বসে। ধান, মরা চাল না বাছলে বাবা রাগ করে। ভাতে এসব পেলে ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে বলবে, খাব না। এটাকে কি ভাত রান্না বলে? সেজন্য ওরা খুব যত্ন করে চাল বেছে ভাত চুলোয় বসায়। এক এক বোন এক একদিন চাল বাছার দায়িত্ব নেয়। কেমন করে যেন কাজটা ভাগ হয়ে গেছে। কাজটা করতে কেউ ভুলে যায় না, কিংবা সময় পাইনি বলে অজুহাতও দেখায় না। শিউলির মনে হয়, বাবাকে যত্ন করার জন্য ওরা সবাই মুখিয়ে থাকে। বাবার প্রতি অবহেলা কেউ দেখাবে এটা ওদের চিন্তায়ও আসে না। শিউলি

অনেকগুলো মরা চাল বের করে। ভাবে, এগুলোর নাম কি করে মরা চাল হল? আসলে এই চালের ভাত হয় না। যে চালের ভাত হয় না সেগুলো মরা। আর সতেজ চালের ভাত হয়। টগবগিয়ে ফুটে উঠলে আস্তে আস্তে বাড়ে। এমন একটি চিন্তার সূত্র গাঁথতে পেরে ও মহাখুশি হয়। একসঙ্গে হাঁড়িতে ফোটার পরও কালো রঙের চালটি একইরকম থাকে। নিজের এই ভাবনায় ও বেশ মজা পায়। চালের বাঁচা মরা নিয়ে ও কাল ক্লাশে ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করবে। বলবে, দেখ চালেরও বেঁচে থাকা মরে যাওয়া আছে। বেঁচে থাকা চাল আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। তার মানে চালেরও বেঁচে থাকা আছে। শিউলি আপনমনে হাসে। ভাবে, মানুষ ইচ্ছা করলেই নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠতে পারে, যদি তার ইচ্ছার সুতোটা আকাশের সব প্রান্ত ছুঁতে পারে। ভাবনা সক্রিয় থাকলে মাথা খালি হয়ে যাবে না। মাথা খালি হয়ে গেলে নিঃসঙ্গতা পেয়ে বসে। শিউলি চাল বেছে হাঁড়িতে ঢালে। ধুয়ে নিয়ে আসে। চুলো জ্বালায়।

তখন হুড়মুড়িয়ে বাড়িতে ঢোকে ছোট তিন বোন। ওরা দৌড়ে আগে এসেছে। বকুল বাবার সঙ্গে আছে। জয়নুল মিয়ার হাঁটতে সময় লাগে। বুঝতে পারে দ্রুত হাঁটতে চাইলেও সেটা আর হয়ে ওঠে না। পা চলতে চায় না। বুকে হাঁফ ধরে। অথচ একসময় কত তেজ ছিল। হাঁটাতে, বলাতে, খাওয়াতে– সব কেমন ফুৎকারে নিভে গেল। চাইলেও সেই তেজ ফিরে আসে না। বকুল আস্তে করে ডাকে, বাজান?

বল মা।

গ্রামের জসিম মোল্লাতো বলেছিল আগামী মাসখানেকের মধ্যে আমার সউদি যাওয়া হবে। আপনি একটু কথা বলে দেখবেন কালকে।

আচ্ছা দেখব।

টাকা পয়সার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। আম্মার যে গয়নাগাঁটি আছে তা বিক্রি করলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। আর যদি কিছু কম পড়ে তাহলে আপনি ধারদেনা করবেন। আমি গিয়ে টাকা পাঠালে শোধ দিবেন।

আচ্ছা মা তাই করব।

আমি চলে গেলে আপনার মন খারাপ হবে না তো বাজান?

খারাপ তো হবেই। আমার বুকের আগুন নিভবে না।

আহা রে বাজান। আমি বেশি দিন থাকব না। আমার পাঠানো টাকা দিয়ে আপনি দালান উঠাবেন। তাই দালানে আমার আম্মাকে নিয়ে আসব।

তোমার আম্মাকে? আসবে না তো।

জোর করে আনব। দরকার হলে সবাই মিলে ধরে আম্মাকে রিকশায় উঠাব।

জয়নুল মিয়া কথা বলে না। বকুলের মনে হয় অকস্মাৎ চারদিক নিঝুম হয়ে গেছে। বাজানের নিঃশ্বাসের শব্দও ভেসে আসে না। বকুল মন খারাপ করে। কেমন করে এই মানুষটি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে? বেঁচে থাকা কি খুব সহজ? বোধহয় সহজ। সেজন্য ধুম করে রাগ ওঠে। সেই রাগের কারণে বিপত্তি ঘটে। সেই বিপত্তি মাথায় নিয়ে আর একজন সহজভাবে বাঁচার জন্য চলে যায় ভাইয়ের সংসারে। এই তো এই সংসারের ইতিহাস। এই ইতিহাসের ছানাপোনা ওরা। ও বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে থামায়। বলে, বাজান আপনি মন খারাপ করবেন না। মন খারাপ করলে আমিও যেতে পারব না।

তুমি যে তোমার মায়ের সব গয়না বিক্রি করে দিতে চাও তা কি তোমার অন্য বোনেরা মানবে?

আমি সবাইকে নতুন গয়না দেব। ওরা রাজি আছে।

তুমি কয় টাকা বেতন পাবে মাগো যে তুমি এতকিছু করতে পারবে?

এ গাঁয়ের যারা বিদেশে থাকে তারা বাড়িতে দালান তুলেছে বাজান। তারা পারলে আমিও পারব।

আচ্ছা দেখা যাক। আমার যেটুকু জমিজমা তা দিয়ে তো সারা বছর ভাতের খোরাক হয়। বাকিতো রাশিদুন চালায়। নিজে খেত্ন মজুরি করে তালেগোলে সংসার চলে।

চলুক। তাওতো চলে।

হ্লি হি করে হাসে বকুল। হাসতে হাসতে বাবার হাত ধরে বলে, চলেন বাজান। এতড়াণে ওরা বোধহয় সব জিলাপি শেষ করেছে।

আমাদের বাদ দিয়ে ওরা একটা জিলাপিও খাবে না রে।

দু'জনে বাড়ির আঙিনায় ঢোকে। দেখতে পায় বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে কলাপাতার টুকরোর উপর জিলাপি সাজাচ্ছে চম্পা আর পদ্ম। হাসুহেনা এক জগ পানি আর একটা গ্লাস এনে রাখে। শিউলি রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। মূর্তির মত। গেটের কাছ থেকে ওকে দেখে বুক ধ্বক করে ওঠে জয়নুলের। ভাবে, মেয়েটার বিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। এখন ওকে দূর থেকে পোড়াকাঠের মত দেখাচ্ছে। পুড়তে পুড়তে কয়লা হয়েছে। সে সময় বকুল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আব্বা দেখেন বুবুকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। গণেশদাদা যেমন প্রতিমা বানায় ঠিক ওই রকম।

গণেশদাদার প্রতিমা?

হ্যাঁ, বাজান একদম সরস্বতীর মত। বুবু হেড মিস্ট্রেস হয়েছে না। এত অল্প বয়সে হেড মিস্ট্রেস– বিদ্যা না থাকলে কি হতে পারে? যাই বুবুকে এই কথা বলি।

বকুল দৌড়ে গিয়ে শিউলিকে জড়িয়ে ধরে। বলে বুবুকে, তোমাকে একদম সরস্বতীর মত দেখাচ্ছে।

সরস্বতী! শিউলি ভ্রূ কুঁচকে তাকায়।

ঠিক বলেছি, একটুও মিথ্যা না।

কি যে বলিস না, আবোলতাবোল। আমাকে বলেছিস ঠিক আছে, আর কাউকে না। পদ্ম চম্পাকেও না।

বকুল মুহূর্তে মিইয়ে যায়।

আমি কি খারাপ কথা বলেছি?

গাঁয়ের লোকে এটা কথা শুনলে হাসবে।

বকুল রুখে দাঁড়িয়ে বলে, বিয়ে করবে না, সংসার করবে না, ছেলেপুলের মা হবে না, দেবী সরস্বতীও বলা যাবে না, তবে তুমি কোন ছাতু হবে? মানুষকে একটা না একটা কিছু হতে হয়।

পেছন থেকে জয়নুল ধমক দিয়ে বলে, চুপ কর বকুল। ভুলে গেছিস যে ও তোর বড় বোন। অর্ধেক সংসার ও চালায়।

ও কি শুধু বাপের সংসার চালাবে? নিজের সংসার করবে না?

হাত্ন পা ছুড়তে ছুঁড়তে ও বারান্দায় গিয়ে মাদুরের ওপর বসে পড়ে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে অন্যরা শুনতে পায় না। পদ্ম চেঁচিয়ে বলে, হ্লৈ চৈ করছ কেন? আজ না আনন্দের দিন। আমরা এখন জিলাপি খাব।

বকুল ওর দিকে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। কলাপাতার উপর রাখা তিনটে জিলাপি হাতে নিয়ে বসে থাকে। বাবারটায় দেওয়া হয়েছে পাঁচটা। বাকিদের তিনটা করে। চম্পা বাবার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে আসে। হাসুহেনা শিউলির হাত ধরেছে। এদের দিকে তাকিয়ে বকুল আবার নিজের অবস্থানে শক্ত হয়। এক হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে, জয় হোক সরস্বতীর! এই তোরা বল, জয় হোক সরস্বতীর! জয়নুল অবাক হয়ে অনুভব করে যে, সেও ওদের সঙ্গে বলছে, জয় হোক সরস্বতীর।

আশ্চর্য এভাবে সবাই মিলে মেয়েটিকে শিক্ষকতায় ঢুকিয়ে দিল। সংসারে না। ওর জীবনের একটা দিক বাদ হয়ে যাবে কি? নাকি ও একসময় ঘুরে দাঁড়াবে? জয়নুল মিয়া হিসাব মেলাতে পারে না। সরস্বতী বলে মেয়েটির দিকে তাকানো হয় না। একটু আগে মেয়েটি ওর কাছে পোড়া কয়লা ছিল, এখন সরস্বতী? নিজেকে বোঝাও কঠিন। বারান্দায় বসার পরে শিউলির বুক ধড়ফড় করে। ওরা ওকে অনেক উঁচুতে উঠিয়ে দিয়েছে। নিজেকে সেখানেই

উৎসর্গ করবে ও। সরস্বতী শব্দে ও আপ্লুত হয়। জয়নুল মিয়াকে বলে, বাজান আপনি বাড়িতে আমাকে সরস্বতী ডাকবেন। আমি যেন ছেলেমেয়েদের বিদ্যা দিতে পারি।

সত্যি মা?

সত্যি বাবা। ওরা ঠিক কথাই বলেছে। আমি আর অন্য কিছু নিয়ে ভাবব না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই থাকব।

তোর নিজের কেউ হবে না?

নিজের এক্ল দুইজন না থাকলে আর কি হবে? আপন করতে পারলে অনেকজনকেই কাছে টানতে পারব বাজান।

আয় তোকে আমি জিলাপি খাইয়ে দেই। হ্যাঁ কর মা।

শিউলি দাঁতের নিচে জিলাপি চিবোয়। সবাই হাততালি দেয়। জয়নুল মিয়া একটু একটু করে একটা জিলাপি ভেঙে সবার মুখে দেয়। বাকিটুকু নিজের মুখে দেয়। ভাবে, এ ওর এক গভীর আনন্দ। মেয়েরা ওর জীবনের সব ফুটো ভরিয়ে দিচ্ছে। শেষ জীবনে দেখা যাবে ওর জীবনের কোথাও কোন ছিদ্র নেই। আহ, ও একজন ফুটোহীন মানুষ হয়ে মরতে পারবে। শুধু রাশিদুনের না থাকার ফুটোটা এ জীবনে আর ভরা হবে না। এতবড় ফুটো ভরে দেওয়ার সাধ্য এই জীবনে আর কারো কাছ থেকে পাওয়া হবে না। এত আনন্দের মধ্যেও জয়নুলের মন ছোট হয়ে থাকে। ও কাউকে কিছু বলতে পারে না। শুধু একবার বলে, রাতে আমি আর কিছু খাব না। এই জিলেপি খেয়েই থাকতে পারব।

এক সঙ্গে হৈ হৈ করে ওঠে সবাই।

তা হবে না বাজান। দুধ গুড় দিয়ে ভাত তো খেতেই হবে। আজ এ বাড়িতে উৎসব।

ও হ্যাঁ, তাতো ঠিকই। আচ্ছা খাব।

বকুল বলে, আপনার গলা পড়ে গেছে বাজান। মনে হয় গলা দিয়ে কথা বের হতে চায় না। আমরা তো জানি আম্মা থাকলে আজ এ বাড়িতে পোলাও রান্না হত। দুধ ভাত বলে খাওয়ার ইচ্ছা নাই।

মাগো তোমরা আমার দুঃখ বাড়িও না।

পদ্ম হাসতে হাসতে বলে, দুঃখ দুঃখ। দুঃখ হল দুধ ভাত। হাপুস্ হুপুস খাই।

শিউলি নিজেও মন মরা হয়ে যায়। মায়ের কথা ওঠায় চুপ করে যায়। মানুষটা বেঁচে থেকেও তাদের কাছে নাই। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয়, মায়ের জিলাপিটা বাবাকে খাওয়ানো দরকার। দু'টো জিলাপি বাবার কলাপাতায় দিয়ে বলে, বাজান খান।

আমাকে আবার কেন মা? তোমরা তো আমাকে বেশিই দিয়েছ।

এই দু'টো আম্মার ভাগের। আপনি খান।

জয়নুল মিয়া প্রথমে থমকে যায়। ভাবে, মেয়েগুলো কি তার সঙ্গে রসিকতা করছে? পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, দাও। আগামীকাল তোমাদের খলিল মামা আসবে। তার হাত দিয়ে তোমাদের আম্মাকে পাঠিয়ে দেব।

আম্মাতো খাবে না। আপনি খান।

আপনি খান বাজান। আমরা আপনার খাওয়া দেখব।

খাওয়া দেখবে? খাওয়া কি দেখার জিনিস?

একজনেরটা আর একজনে খেলে সেটা দেখার জিনিস হয়! বাজান আপনি কি বোঝেন না?

পদ্ম! শিউলি ওর গালে ঠাস করে চড় মারে। পদ্ম আকস্মিক বিমূঢ়তা কাটিয়ে কাঁদতে শুরু করে। হাত পা ছুঁড়ে কলাপাতাগুলো উঠোনে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢোকে। চিৎকার করে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে মা, মা করে ডাকে। এক সময় বলে, আপনি আজ এ বাড়িতে থাকলে শিউলি বুবু আমাকে মারতে পারত না। বাজান তো আমাদের হাতের পুতুল। আমরা যেমন খেলি তেমন থাকে। নড়েও না চড়েও না। নইলে শিউলি বুবুকে তো একটা ধমক দিতে পারত বাজান। আমাকে মারার জন্য শিউলি বুবুকে কেউ কিছু বলেনি। ওঁ ওঁ আঁ–।

শিউলি দেখতে পায় পদ্মর কান্নার দিকে কেউ তেমন নজর দিচ্ছে না। ওরা তিন বোন উঠোনে নেমে কলাপাতা কুড়াচ্ছে। দাঁড়িয়ে কথা বলছে। রান্নাঘরে গিয়ে চুলোর জ্বাল ঠিক করে দিচ্ছে। জয়নুল মিয়া এক গ্লাস পানি খেয়ে শিউলিকে বলে, ওকে উঠিয়ে নিয়ে আয়।

নিজে নিজে উঠবে বাজান। বেশি তোয়াজ করতে হবে না।

ও না উঠলে আমি যে দুধ ভাত খেতে পারব না।

শিউলি থমকে গিয়ে এক মিনিট চুপ করে থাকে। তারপর ঘরে ঢুকে পদ্মর হাত ধরে টেনে বলে, এই ওঠ। বাজান তোকে ডাকে।

আমি কি বাজানের কাছে মাফ চাইব।

না, কিছু করতে হবে না। সোজা উঠোনে চলে যাবি।

পদ্ম ধড়মড়িয়ে উঠে বসে একলাফে উঠোনে চলে যায়। শিউলি বুঝতে পারে যে এটুকুর জন্য ওর অপেক্ষা ছিল। কেউ সাধাসাধি না করলে রাগ করাটা যুৎসই হয় না। অল্পক্ষণের মধ্যে আবার লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে শিউলিকে ঘরে টেনে বলে, আজ মা থাকলে আরও অনেক আনন্দ হত। আমিতো মায়ের জন্যই কেঁদেছি। আমার জন্ম না হলে মাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হত না।

চুপ কর। আমাদের জন্ম না হলেও মাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে হত না। তুই যদি বাব্ল মায়ের একটা মেয়ে হতি তাহলে অনেক আদরে থাকতে পারতি রে পদ্ম।

পদ্ম গুনগুন করে কাঁদে। খুব চেপে চেপে। শব্দ বের হতে দেয় না। শিউলি ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, কাঁদিস না। তোর কান্না শুনলে বাবা মন খারাপ করবে। তুই পড়তে বস। আমি দুধ ভাত গুছিয়ে সবাইকে খেতে ডাকব।

অনেক রাত পর্যন্ত অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে শিউলি।

ঘুম আসে না।

পদ্ম মায়ের জন্য কেঁদেছে, ও কাঁদতে পারছে না। বুকের ভেতরের পুরো অংশ জমাট হয়ে আছে। ও দরজা খুলে বাইরে আসে। বাকিরা টের পায়নি। মাদুরের উপর কাঁথা বিছিয়ে ওরা পাঁচ বোন ঘুমায়। কখনো মনে হয়নি এরচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের দরকার আছে। মা বেঁচে থেকেও কাছে নেই এই অভাবের কাছে সবকিছু চুরমার হয়ে গেছে। শিউলি বারান্দায় বসে থাকে। বাড়ির বাইরের বড় জামগাছটা অন্ধকারে এক অদৃশ্য দোজখ। ও আবার ঘরে ঢোকে। আবার বাইরে আসে। ও দোজখ দেখতে চায় না। তবু চারদিকের অন্ধকার দোজখের মত ঘণীভূত হয়।

ও বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে গুনগুনিয়ে কাঁদে। বকুল এসে ওর পাশে বসে।

সরস্বতী কাঁদিস কেন?

উত্তর নেই।

একটু পরে হাসুহেনা উঠে এসে ওর পাশে বসে।

শিউলিমালা কাঁদ কেন?

উত্তর নেই।

উঠে আসে চম্পা। ওর পাশে বসে ডান হাত ধরে।

দুধ গুড়ের বুবু কাঁদ কেন?

উত্তর নেই।

উঠে এসে পাশে বসে পদ্ম।

সরকারি স্কুলের বড় আপা কাঁদ কেন?

উত্তর নেই।

তখন চার বোন একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, কাঁদ কেন? রাত দুপুরে কাঁদলে ঘরে অলক্ষ্মী ঢুকবে।

শিউলি দাঁত কিড়মিড় করে বলে, ওই অলক্ষ্মীর জন্য কাঁদি। অলক্ষ্মীটাতো ঘরে নাই। আর কোনদিন এই ঘরে ঢুকবে না।

চার বোন একসঙ্গে বলে, তুমি মায়ের জন্য কাঁদ?

শিউলি হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে বলে, সন্তান প্রসবের সময় হারামজাদী মরতে পারল না! বেঁচে থেকে তো আমাদের জ্বালা বাড়িয়েছে।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক

অনুবাদ গল্প

জনৈক ভারতীয়র মৃত্যু

কিশোরীচরণ দাস

আবহাওয়া ঘোষক আজ জানিয়ে দিয়েছেন, সন্ধ্যার দিকে তুষারপাত হতে পারে। এটা দুপুরের খবর। কোন একজন ডগলাস নিউ ফ্রন্টিয়ার নেল্‌স্‌-এর অনুষ্ঠান পরিবেশন করার সময়ই এই খবরটি জানিয়েছেন। তার জন্যে নির্দিষ্ট এই সময়টিতে ব্যাপারটি ঘটে এই রকম: টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে ওঠে জনৈকার দীর্ঘ পেলব আঙুল। ওপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা তরল পদার্থ আঙুলের ডগায় পড়ছে; ঝকঝকে হয়ে উঠছে নখগুলি; নখের অধিকারিণী অলসভঙ্গিতে একটি সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে একটি সিগারেট ধরালেন এবং কয়েকটি চমৎকার মদির মুহূর্ত ধোঁয়ায় ভাসিয়ে দিলেন। যথাযথ আবহসঙ্গীতের মধ্যেই মহিলাটির আলতো স্পর্শধন্য সিগারেটটি চরম আনন্দ দিয়ে ছাই হয়ে গেল। অতঃপর হাসিমুখে জন ডগলাস প্রবেশ করে জানালেন, 'এই আনন্দ আপনারাও কিনতে পারেন যদি অমুক কোম্পানির অমুক সামগ্রী ব্যবহার করেন।'

এখন অবধি বিদেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি। এম্ব্যাসির কয়েকজন ভারতীয়র সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বটে, তবে তেমন আলাপ নয়। সুপার মার্কেটে কিংবা পথচলতি শাড়ি-পরা কোন মহিলাকে দেখলেই স্বজন দেখার আনন্দে আমাদের চোখ চকচক করে উঠত– ওই যে একজন ভারতীয়। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে আলাপ করবার কোন আগ্রহ দেখা যেত না। রঙ-করা ঠোঁটটা হয়তো-বা একটু নড়ে উঠত, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

এরপরই আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার নাম জন ডগলাস, আপনাদের আবহাওয়া বার্তা ঘোষক। আজকের আবহাওয়া এক মজার মোড় নিয়েছে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে, সন্ধ্যায় আবহাওয়ার খবর পেলাম উইপোকার উচ্ছেদসাধ নে বদ্ধপরিকর এক সংস্থার সৌজন্যে। রাত্রের খবরও পেলাম কিচেন সিন্‌কএর ত ত্ত্বাবধানে নিবেদিতপ্রাণ আরেকটি প্রতিষ্ঠানের দৌলতে।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা অবশ্য খবর শুনে নাচতে শুরম্ন করে দিল। সবাই মিলে এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন আর মন্তব্য ছুঁড়ে দিল আমার দিকে, 'কেমনভাবে বরফ পড়বে? বালির মত না নুড়ির মত? রাস্তায় লোকেরা এ সময় হাঁটে কী করে? আমি বলে দিচ্ছি আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার ধারটা আমাদের পরিস্কার করতে হবে, নইলে একশো ডলার ফাইন হবেই, দেখো।'

লতিকার চোখেও একটা আগ্রহ চকচক করে উঠল; কিন্তু সে সেটা প্রকাশ করল না। হঠাৎ চকচকে ভাবটা কেটে গিয়ে নিভে গেল ওর চোখদুটো– তুষার, বড়ো ঠাণ্ডা। লতিকার পক্ষে বিদেশের এই ঠাণ্ডা সহ্য করা কঠিন। অন্য কারণও আছে মনে হল। আজকের কাগজেই খবর বেরিয়েছে ল্যানসবুর্গএর দোকানে 'সেল' শুরু হয়েছে– লেডিস কোট অত্যন্ত সস্তায়, মাত্র তিরিশ ডলারে আর বাচ্চামেয়ের পোশাক মাত্র তিন ডলারে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে বরফ পড়লে কী করে বাইরে বেরোবে? লতিকাকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে হল, বললাম, 'আচ্ছা, তুমি নিশ্চয়ই সেল্‌এর কথা ভাবছ, তাই না? মন খারাপ কোরো না লক্ষ্মীটি; এই দেশে তুমি রোজই সেল্‌এর খবর পা বে, আজ, কাল, প্রত্যেকদিন, আজ ল্যানসবুর্গএর কাল হয় তো সিআরস্‌এর... নি শ্চয়ই প্রত্যেকবারই তুমি সুযোগ হারাবে না।'

লতিকা তবুও অখুশি। সে নতুন করে শুরু করল, 'দেখ, শুধুমাত্র তোমার জন্যেই আমার সব জিনিস দেশে ফেলে আসতে হয়েছে। তাই, আজ যখন এখানকার সব ভারতীয় মেয়েদের প্রত্যেকটি শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা একটা করে কোট রয়েছে তখন তোমার স্ত্রীর আছে মাত্র দেড়খানা কোট! তুমি স্বচ্ছন্দে সেল্ নিয়ে ঠাট্টা করতে পারো, কিন্তু আমি জানি ওই একই জিনিস তুমি দোকান থেকে ষাটটি ডলার দিয়ে কিনবে। যাক গে, যা খুশি বলে যাও তুমি।'

আমার প্রথম সন্তানটি মার পড়া নিল। ও জানাল ওর সহপাঠী বান্ধবীর কাছে পাকা খবর আছে যে, কাছাকাছি ড্রাগস্টোরএর সেল্‌এ মাত্র তিরিশ সেন্টে বল পয়েন্ট পেন পাওয়া যাচ্ছে।

মেজো মেয়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার মোজায় আমেরিকার শীত ঠেকানো যায় না। তাছাড়া, একজোড়া দস্তানা আর কানঢাকা মাফলার তার চাইই। নই লে এই শীতের ঝাপটা সহ্য করে স্কুলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভবই নয়। রে'আন্টি নাকি ওকে বলেছেন যে ফোরটিনথ স্ট্রিট-এর এক দোকানে অতি সামান্য দামে জিনিসগুলি পাওয়া যাচ্ছে।

অবশেষ আমার কনিষ্ঠ সন্তানটি সুর টেনে বলে উঠল, 'বাপি, আমায় একটা সেল্ এনে দাও না, দা–ও না।

যথাসময়ে আমি অবশ্য আবার সেই তুষারপাতের বিষয়ে ওদের ফিরিয়ে আনতে পারলাম। সত্যি, সেল্ ব্যাপারটা রীতিমত বিস্ময়কর। তবে তুষারপাত আরো বিরাট, আরো বিস্ময়কর ব্যাপার। যেখানে আমরা বাস করি, ভারতবর্ষের সেই সমতলে এ দৃশ্য অনুপস্থিত। দৃশ্যটা একবার মনে কর তো... উঁচু আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে ছোট ছোট অনাবিল শুভ্র কণা, তাদের গায়ে সভ্যতার ধোঁয়াশা নেই, নেই কোন শব্দ, গন্ধ, বর্ণালী বৈষম্য। তারা আসছে, তারা ঝরছে, ক্ষণিকের জন্যে অসীম মূল্যবোধের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

এইভাবে তুষারপাতের বিষয়টিকে আমি ধরে রাখছিলাম। লতিকা কিছুক্ষণ শুনল, তারপর বলল, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছে এর আরেকটা দিক আছে। জীবন্ত দেহ উষ্ণ, মৃতদেহ ঠাণ্ডা। সুতরাং তুমি যদি বলতে চাও–

আমি বাকিটা জানতাম, 'বরফ মৃত্যুর প্রতীক' ইত্যাদি বহুল প্রচলিত বিকৃত যতসব বিরূপ উক্তি। আমি আর কথা বাড়ালাম না। বুঝতে পারছি, লতিকা আমাকে খোঁচাতে চাইছে।

ওয়াশিংটন ডি সি-তে প্রথম তুষারপাত দেখার প্রতীক্ষায় আমরা উদগ্রীব হয়ে রইলাম। প্রায় দু'মাস হল আমরা এই শহরে এসেছি। ভারত সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী থাকব তিন বছর।

এখন অবধি বিদেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি। এম্ব্যাসির কয়েকজন ভারতীয়র সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বটে, তবে তেমন আলাপ নয়। সুপার মার্কেটে কিংবা পথচলতি শাড়িপরা কোন মহিলাকে দেখলেই স্বজন দেখার আনন্দে আমাদের চোখ চকচক করে উঠত– ওই যে একজন ভারতীয়। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে আলাপ করবার কোন আগ্রহ দেখা যেত না। রঙকরা ঠোঁটটা হয়তোবা একটু ন ড়ে উঠত, কিন্তু ওই পর্যন্তই। লতিকাকে বিরস দেখে আমাকে বোঝাতে হত, বুঝতে পারছ না কেন, আমরা সবাই একই পরিবারের। আমরা কি আমাদের পরিবারের কাউকে যখনতখন 'কী খবর' 'কেমন আছো' বলি? এটাই তো আনন্দের যে আমরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি এই বিদেশী শহরে নানান ঝক্কিঝা মেলার মধ্যেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। হয়তো এই মহিলাও আমাদের মত তার আলু-ছোলে বানাবার জন্যে দুর্লভ মেক্সিক্যান চিক পিজএর ধা ন্দায় ঘুরছেন। কিংবা সুজির ইংরেজি নাম মনে করবার চেষ্টা করছেন, কিংবা সস্তায় সেল্‌এ জিনিস খুঁজ ছেন যাতে ফরেন এ্যালাউন্সএর সবটা কা জে লাগিয়ে দেশে গোটাকতক জিনিস নিয়ে যাওয়া যায়। দেখতে পাচ্ছো না, ভদ্রমহিলা ভারতীয়। আমাদেরই একজন।

কাজেই, দেশের ছুটির বিকেলে আত্মীয়-স্বজন বা পাড়াপড়শীর মত হঠাৎ উপস্থিত হয়ে আমাদের বিব্রত করবার মত পরিবেশ এখানে নেই। এখানে আমরা নিজেদের মধ্যে একাকার হয়ে পরিবারের পরস্পরের উষ্ণ সান্নিধ্যের ভেতর থেকে তুষারকে স্বাগত জানাবার প্রতীক্ষায় রয়েছি।

টেলিফোনের কথাটা অবশ্য আমার মনে পড়েনি। একটানা ঝনঝন আওয়াজে টেলিফোন ধরলাম। একটি মহিলাকণ্ঠ, 'মিসেস দাসকে একবার ডেকে দিন না।'

ভাবলাম ইনি নিশ্চয়ই মিসেস রে' কিংবা মিসেস কাপুর। ওই ভদ্রমহিলা দু'জনই ওঁদের স্বামীসহ আমাদের এখানকার বসবাস নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ওঁদের বাক্যালাপ মোটামুটি অনুমান করতে পারলাম– গাড়ি কিনছেন কবে? আমার হাসব্যান্ড বলছিলেন নতুন ফোর্ড ফ্যালাক্সি ইম্পালার থেকেও একটু ভাল... নতুন বেন্ডারটা ব্যবহার করেছেন?... ঠিকমত কাজ দিচ্ছে না? আমি আগেই ভেবেছিলাম। আমি বলিনি আপনাকে অস্টারাইজার কিনতে? ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার অনুমান প্রায় যথার্থ। দশমিনিট ধরে টেলিফোনে কথা বলে (এবং শুনে) লতিকা সংক্ষেপে বলল, 'মিসেস কাপুর কথা বলছিলেন। চমৎকার মহিলা। ছেলেমেয়েদের ভালমন্দ খবর নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন গাড়ির ব্যাপারে মনস্থির করেছি কিনা! হ্যাঁ, আরো বললেন যে লার্নরিসএ

সাহনী আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। কী বলতে চান উনি? আমি ওই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাব, গভীর রাতে প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে? প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করবার আগেই সজোরে উত্তরটা মনে ধাক্কা মারল– রঙ্গরাও তো আমারই একজন ছিলেন; সত্যিই, ভারি লজ্জার কথা। আত্মানুশোচনাকে বেশিদূর এগোতে দিলাম না। সাহনীকে বললাম, 'হ্যাঁ, আমিও যেতে চাই।

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নাকি খুব সস্তার সেল্‌এ পাওয়া যা চ্ছে।' এক মুহূর্ত চুপ করে লতিকা বলল, 'মনে হচ্ছে, আজ সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রচ- তুষারপাত হবে। মিসেস কাপুর টেলিফোনে খবর পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ বাপি, এখানে না টেলিফোনে আবহাওয়ার খবর দেয়। তুমি শুধু ফোনটা তুলবে অমনি খবর এসে যাবে। তুমি তো নম্বরটা জানো, না বাপি?'

'না, জানি না।' আমি থামিয়ে দিলাম। বৈজ্ঞানিক শিড়্গায় গতিপ্রকৃতির কি কোন শেষ নেই।

অবশেষে সেই তুষার এল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ধূসর আকাশ টকটকে লাল হয়ে উঠল। তারপরই দেখলাম রুপোলি কণাগুলি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এগুলিই কি সেই তুষার? নাকি ধূলিকণাগুলি বিবর্ণ সন্ধ্যায় ঝকমক করে উঠছে। কয়েকটি আমার দিকে এল। তাদের ধরতে চাইলাম আমি, বদলে পেলাম শিশিরকণা ধরার এক অচরিতার্থ অনুভূতি। আকাশটা ফেটে ঝরে পড়েছে মিহি কণাগুলি, একটু একটু করে আকারে বড় হচ্ছে, আরো বড়, এক একটা চপল কিশোর অপার প্রগল্‌ভতায় খেলছে ছুটছে, তাড়া করছে, ঝরে পড়ছে একে অপরের ওপর, ফুরফুরে, হাল্কা, আপাত মূল্যহীন। না, আমি তোমাদের সত্যি বলে মানতে রাজি নই।

সত্যি তুষার এল পূর্ণ সমারোহে, কিন্তু মুহূর্তমাত্র আগে নয়। ইতোমধ্যে তুষার কণাগুলি তাদের চিহ্ন ঘাসের বুকে আর গাছগাছালির সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিয়েছে। তারা ঝকমক করছে, মেতে উঠছে ক্ষণিকের উলাসে। এদিকে শুভ্র তন্তুর মত, শুভ্র গুচ্ছের মত শ্বেতশুভ্র পি-গুলি ঝরে পড়ছে ধরিত্রীর বুকে। একেই বলে তুষারপাত। রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলাম তুষারপাতের এই সর্বব্যাপী উন্মাদনা। এমন কি লতিকা যে আমার কাঁধে ভর দিয়ে ভাল করে তুষারপাতের দৃশ্য দেখতে চাইছে সে ব্যাপারটাও আমার তন্ময়তা ভাঙতে পারল না। ইচ্ছে হল, আমি ঠিক মধ্যিখানে ঢুকে পড়ি। ইচ্ছে হল, এই মহা সমারোহকে আমার সর্বাঙ্গে ধারণ করে দিনগত জীবনযাপনের গ্লানি থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করি, শুচি হই। আমার ইচ্ছে হল... কিন্তু বৃথাই। টেলিফোন বেজে উঠল।

'কে?' কঠিন স্বরে মাউথপিসটা ধরলাম।

'আমি সাহনী বলছি স্যার। আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। রঙ্গরাও আজ সন্ধ্যায় জর্জটাউন হসপিটালে মারা গেছে।

'মারা গেছে? রঙ্গরাও? কে রঙ্গরাও?'

'রঙ্গরাও এম্ব্যাসির একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। কিডনি ট্রাব্‌ল-এ অনেকদিন ধরেই ভুগছিলেন। বিধবা স্ত্রী আর একটি মেয়ে রেখে গেছেন।'

এবার আমার মনে পড়ল। কয়েকদিন আগে এক বিকেলে আমরা সবাই এক ডিপার্টমেন্ট স্টোরএ গি য়েছিলাম নাম, বার্গেন সিটি। সেখানে কিসি নামধারিণী এক পুতুলের কিস্‌এর বহর দেখে খুব মজা পেয়েছিলাম আমরা। ওর হাতে চাপ দিয়েছ কি অমনি তোমার দিকে চুমু ছুঁড়ে দিতে থাকবে সে। দশ ডলারের বিনিময়ে এই চিজটি কেনার তাৎপর্য সম্বন্ধে যখন কথা বলছিলাম তখন এক ভারতীয় ভদ্রলোক আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, ওই সে সাদা শাড়ি পরা মহিলাটিকে দেখছেন– স্যাড কেস। ওঁর হাসব্যান্ড তিনমাস ধরে অসুখে ভুগছেন। দিন ঘনিয়ে এসেছে। বেচারি মহিলাটি টাইপিস্টএর চাকরি করে কোনরকমে চালাচ্ছেন। চকিতে ভদ্রমহিলাকে দেখলাম। কোনাকুনি মত মুখ, গভীর দুটো চোখ, হাঁটছেন দ্রুত, স্বচ্ছন্দ, যদিও দু'হাতে পাহাড়প্রমাণ জিনিসপত্রে উপচেওঠা ব ্যাগ। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হয়, আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি অনভ্যস্ত। সাহনী বলে যান, 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আজ রাত এগারটায়। বেশ কিছু ভারতীয় আসবেন মনে হয়।'

সাহনী আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। কী বলতে চান উনি? আমি ওই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাব, গভীর রাতে প্রচ- তুষারপাতের মধ্যে? প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করবার আগেই সজোরে উত্তরটা মনে ধাক্কা মারল– রঙ্গরাও তো আমারই একজন ছিলেন; সত্যিই, ভারি লজ্জার কথা। আত্মানুশোচনাকে বেশিদূর এগোতে দিলাম না। সাহনীকে বললাম, 'হ্যাঁ, আমিও যেতে চাই। আপনি কি এসে আমাকে নিয়ে যাবেন?' সাহনী আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে রাত সাড়ে দশটায় তিনি গাড়ি নিয়ে আমার এখানে আসবেন।

আমি লতিকাকে সব বললাম। লতিকা বলল, 'আমার নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত। সত্যিই বড় দুঃখের, না? আচ্ছা, ভারত সরকার ভদ্রমহিলার দেশে ফেরার খরচ দেবেন তো... তোমার টপকোট আর টুপি নিতে ভুলো না কিন্তু... আচ্ছা, মহিলারা কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যেতে পারে আহা, যদি জানতাম!'

বড় মেয়ে চুপ করে না থাকতে পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কে মারা গেছেন বাপি?'

'একজন ভারতীয়।'

ছেলেমেয়েরা পরস্পরের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। আমি অবাক হলাম। কিন্তু চারবছরের শিশুটির গম্ভীর মুখ, চাপা ঠোঁট আর কাঁপাকাঁপা চোখ দেখে অস্বস্তি বোধ করলাম। উদ্ভট প্রশ্ন করাটা এর একটা বৈশিষ্ট্য। ভেবে ভয় হল, এখনি হয়তো প্রশ্ন করে বসবে– ভারতীয় মানে কী?

আমি ওকে ভুল বুঝেছি মনে হল। বস্তুত, গোটা পরিবারের সবাই যেন নৈঃশব্দ্যের একটা তাগিদ অনুভব করছিল। পরিস্থিতিটা সকলের কাছেই অস্পষ্টভাবে জ্ঞাত অথচ ঠিক ঠিক বোধের অগম্য।

জানলার ধারে গিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলি দেখতে চাইলাম আমি। তুষারপাতের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করতে চাইলাম। একজন ভারতবাসীর মৃত্যুর কথা মনে পড়তে লাগল, তা সত্ত্বেও। বরফঢাকা গাড়ি গুলি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। নিয়ন বাতিগুলি তুষারকণা ঝেড়ে ফেলে দুর্বৃত্তের মত মিটমিটি করে সাহসী পথচারীদের দিকে

সত্যি তুষার এল পূর্ণ সমারোহে, কিন্তু মুহূর্তমাত্র আগে নয়। ইতোমধ্যে তুষার কণাগুলি তাদের চিহ্ন ঘাসের বুকে আর গাছগাছালির সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিয়েছে। তারা ঝকমক করছে, মেতে উঠছে ক্ষণিকের উলাসে। এদিকে শুভ্র তন্তুর মত, শুভ্র গুচ্ছের মত শ্বেতশুভ্র পি-গুলি ঝরে পড়ছে ধরিত্রীর বুকে। একেই বলে তুষারপাত। রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলাম তুষারপাতের এই সর্বব্যাপী উন্মাদনা।

রাত্রের খাবার খেয়ে পরপর তিনটি সিগারেট নিঃশেষ করেছি, এমন সময় সাহনী এলেন। ঘড়ি দেখলাম, বড়জোর পাঁচমিনিট দেরি করেছেন ভদ্রলোক। তবু আমি বিড়বিড় করে দেরি করার ব্যাপারটা উলেখ করে তাড়াতাড়ি ওর সঙ্গে ভোক্সওয়াগেন-এ গিয়ে বসলাম। বাচ্চারা সব শুয়ে পড়েছে। লতিকা কিন্তু বড় বড় চোখে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, বারবার বলল, ও যদি জানত অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে মেয়েরা বেমানান নয় তাহলে ও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যেত।

চাইছে। নাইট ক্লাব আর বারএ এক উ ত্তেজিত সন্ধ্যার আমন্ত্রণ যেন আমি অনুভব করছি। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, বন্ধুবা ন্ধবীরা আর এক বড় গাস চাইছে, আরো বড় গাস, একটু হাসিঠা ট্টা, আরো একটু প্রকৃতির সুরের সঙ্গে তাল রেখে তারা মেতে উঠতে চাইছে। দেখতে পাচ্ছি, অন্তরঙ্গরা পরস্পরের আরো অন্তরঙ্গ হবার দুরন্ত এক আবেগ অনুভব করছে। পরক্ষণেই মনে হল, এই তুষারপাত জীবনকে আহ্বান করে বলছে, 'যতক্ষণ পরস্পরের সান্নিধ্যে রয়েছ দ্রুততর কর তোমাদের ছন্দিত জীবনযাত্রা।' আর আমি! এক বিদেশী, তুষারাহত এক নির্বোধ ভারতীয়, ঝরে পড়া বস্তুগুলিকে অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে দেখেই চলেছি।

নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গরাওকে অভিশাপ দেবার একটা কুটিল ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসলে উনি বোধহয় আমাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই কিংবা যেঅ চেনা দেশকে আমি সবে চিনতে পারার আনন্দে আনন্দিত, তাকে দাবিয়ে দেবার জন্যেই আজ এই মৃত্যুপর্বটি ঘটালেন।

...রাত্রের খাবার খেয়ে পরপর তিনটি সিগারেট নিঃশেষ করেছি, এমন সময় সাহনী এলেন। ঘড়ি দেখলাম, বড়জোর পাঁচমিনিট দেরি করেছেন ভদ্রলোক। তবু আমি বিড়বিড় করে দেরি করার ব্যাপারটা উলেখ করে তাড়াতাড়ি ওর সঙ্গে ভোক্সওয়াগেনএ গি য়ে বসলাম। বাচ্চারা সব শুয়ে পড়েছে। লতিকা কিন্তু বড় বড় চোখে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, বারবার বলল, ও যদি জানত অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে মেয়েরা বেমানান নয় তাহলে ও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যেত। আলতো হেসে আমি ওকে বিদায় দিলাম।... আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলেন সাহনী। উঁচুগ্রামে রেডিও চালানো ওঁর অভ্যেস। এখন দেখলাম, বেশি স্বস্তিকর নিচুস্বরে চলছে। ভাবলাম, এ হয়তো আজকের যাত্রার উদ্দেশ্যটা মনে রেখেই করা হয়েছে। অবশ্য নৈঃশব্দ্যকে ভরিয়ে তোলার ব্যাপারে সাহনীর ক্লান্তি ছিল না, জাগতিক সব ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করে চলেছেন। যেমন: মনে হচ্ছে এবার তুষারপাত তেমন ভয়ংকর হবে না, গত বছর প্রথম তুষারপাত হয়েছিল সাত ইঞ্চি গভীর... মিসেস দাস কিছু ভাল নাইলন খুঁজছিলেন, না? আমার মনে হয় এসব নিউইয়র্কএ না কি নে সরাসরি হংকং থেকে ইম্পোর্ট করাই ভাল... এই এলাকায় সস্তায় বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে... কিন্তু, কিন্তু এটা আসলে নিগ্রো এলাকা... ডানদিকের রাস্তাটা ব্যানার্জির বাড়ির দিকে গেছে। বেশ চালাক চতুর এই ব্যানার্জি, এখানে আর এক কিস্তি থাকাটা ম্যানেজ করে নিয়েছে।...

হঠাৎ বোধহয় ওঁর মনে হল আমি আর একটু প্রাসঙ্গিক কিছু শুনতে চাইছি। রঙ্গরাওএর প্র সঙ্গে গেলেন সাহনী, চমৎকার মহিলা কথাটা শেষ করার আগেই আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলাম। একটা সাদামাটা সমতল ছাদওলা বাড়ি দেখিয়ে সাহনী বললেন, 'ওই হচ্ছে বাড়িটা, লি'স ফিউনারাল হোম।'

দ্বিতীয় চিন্তায় আমি বাড়িটাকে পছন্দ কররাম। হ্যাঁ, এই হোম এই ধরনেরই হওয়া উচিত, সাধারণ সাদামাটা মহান মৃত্যুর কাছে বিনত।

বাড়িটার সামনে অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে। 'সব কটাই ভারতীয়দের', সাহনীর নিশ্চিত উক্তি, আমাদের স্বদেশীয়দের এই বিরাট সমাবেশ দেখে আমি অভিভূত হলাম, বললাম, 'এতগুলো গাড়ি?' সাহনী আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, ওয়াশিংটনের প্রায় সব ভারতীয়র গাড়ি আছে।'

তিনি আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমার টুপি আর ওভারকোট রাখলাম। ভিতরের হলঘরে যাবার মুখে সাপস্নাই মিশানএর মি. সাক সেনার সঙ্গে দেখা হল। হেসে বললাম, 'কী খবর?'

অবাক হয়ে দেখলাম, তিনি হাসলেনও না, ঠোঁটও নাড়লেন না। হলঘরটা লোকজনে ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে। মহিলা এবং পুরুষ সবাই কালোপোশাক পরে পিঠ-সোজা চেয়ারে বসে আছেন। একটা চাপা অস্বস্তিতে পরিবেশটা রীতিমত থমথম করছে। উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মএ সর্বাঙ্গ ঢাকা কী যেন বিছানায় শোয়ানো। নিশ্চয়ই মৃত দেহটি।

রঙ্গরাওএর দেহ। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এই যুবকটি কেন এসেছিল এই অ্যামেরিকায়? বিদেশের মাটিতে মরতে? সান্ত্বনাহীন একটি তরুণীকে, অবলম্বনহীন একটি শিশুকে ফেলে যেতে? আমার অনেকগুলি দীর্ঘশ্বাস মিলেমিশে একাকার হয়ে প্রাণপণে শোকস্তব্ধ হতে চাইল। মনে হল, এই হিমশীতল রাতের অন্ধকার আমাদের ওয়াশিংটন ডি সির সমস্ত ভারতবাসীকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে এই ট্র্যাজেডির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তলিয়ে যাবার একটা আশ্চর্য অনুভূতিতে আমি কেঁপে উঠলাম।

রঙ্গরাওএর উপর হিং সে হল। এর থেকে আর কী বেশি সে আশা করতে পারত?

ইতোমধ্যে পোশাকের খসখসানি আর পদশব্দ শুনতে পেলাম। আমার বাঁপা শের ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন– 'স্বয়ং অ্যাম্বাসাডর।'

হ্যাঁ, দু'জন পদস্থ অফিসারসহ মন্থরগতিতে অ্যাম্বাসাডর আসছেন। আমার চেনা সেকেন্ড সেক্রেটরি মি. শাহকে দেখতে পেলাম। ওঁর দিকে হাসিহাসি মুখে তাকালাম। কিন্তু ওপক্ষ থেকে হাসি কিংবা অভিবাদন কিছুই এল না। এবার আমি মোটামুটি বুঝে নিলাম শাহ আর সাকসেনারা অনেক বেশি কেতাদুরস্ত। মৃত্যুশীতল ঘরে মৃদুহাস্য বা ওই ধরনের কোন চপলতাকে ওরা প্রশ্রয় দেবে না।

আমি লজ্জিত বোধ করলাম। একান্তভাবে চাইলাম, এ ধরনের বোকামি আর কখনো যেন না করি। এবার আমি সোজা হয়ে বসে সরাসরি সামনের দিকে চোখ রাখলাম আর সকলের, এমনকি অ্যাম্বাসাডরের মত।

চুপচাপ অপেক্ষা করছি এমন সময় হঠাৎ এই নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে, মনে হল, তাইতো, তিনি কোথায়? শুধুমাত্র তার

রঙ্গরাও-এর দেহ। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এই যুবকটি কেন এসেছিল এই অ্যামেরিকায়? বিদেশের মাটিতে মরতে? সান্ত্বনাহীন একটি তরুণীকে, অবলম্বনহীন একটি শিশুকে ফেলে যেতে? আমার অনেকগুলি দীর্ঘশ্বাস মিলেমিশে একাকার হয়ে প্রাণপণে শোকস্তব্ধ হতে চাইল। মনে হল, এই হিমশীতল রাতের অন্ধকার আমাদের ওয়াশিংটন ডি সি-র সমস্ত ভারতবাসীকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে এই ট্র্যাজেডির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

ছোট্ট একটা গোঙানি শুনতে পেলাম। সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর। অনেকটা বিদ্যুৎশিখার মত, যা ক্ষণিকের জন্যে ঝলসে ওঠে কিন্তু গভীর দাগ কেটে দেয় আকাশের বুকে। গুমরে-ওঠা অনেক কথা যেন এক লহমায় উচ্চারিত হতে গিয়ে আবার তলিয়ে গেল। হ্যাঁ, এ সেই বিধবা, মিসেস রঙ্গরাও-এর কণ্ঠস্বর। শেষ মুহূর্তে এক অর্ধস্ফুট আর্তির মধ্যে দিয়ে এই মানবী তার মানবিক দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেললেন। প্রবল সহানুভূতিতে আমি ওর দিকে চাইলাম।

উপস্থিতি নয়, দরদর ধারে অশ্রু, মুছে যাওয়া কাজল, ছিন্ন মলিন শাড়ি, করুণ বিলাপ আর অসংলগ্ন ভাষায় বিধাতার কাছে বিক্ষোভ– সব মিলিয়ে সরব সকরুণ এক বিধবাকে আমি প্রত্যাশা করছিলাম।

অবশ্য বেশিক্ষণ লাগল না এই ভাবনাটা সরে যেতে। মিসেস রঙ্গরাও নিশ্চয়ই এখানে উপস্থিত। সম্ভবত সামনের সারিতেই রয়েছেন। কিন্তু তিনি মার্জিত রুচির মহিলা। লি'স ফিউনারাল হোম আর গঙ্গার শ্মশানঘাটে যে অনেক তফাৎ। আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা এই সামগ্রিক শোকের মূর্তিটিকে তিনি বিশ্রীভাবে আর্তনাদ করে কিছুতেই নষ্ট করতে পারেন না। ভদ্রমহিলার সংযমকে মনে মনে প্রশংসা করলাম আর স্থির করলাম লতিকাকে ব্যাপারটা জানাতে হবে।

মিনিটগুলি বয়ে যাচ্ছে। ঘড়ি দেখলাম– বারোটা অতিক্রান্ত। আচ্ছা, আমরা কী জন্যে এখনো বসে আছি? কৃত্যগুলি শুরু হবে কখন? লক্ষ্য করলাম বেশ কয়েকজন চেয়ারে বসে উসখুস করছেন। আমার পাশের শান্তশিষ্ট মহিলাটি বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছেন। নজরে পড়ল, এক ভদ্রলোক মরফিউসএর প্রাধান্য কিছুতেই মানতে চাইছেন না। মাঝেমাঝে গা ঝাড়া দিয়ে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছেন আর আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করছেন। সামনের সারিতে একজন, সম্ভবত মি. কুলকার্নি, ফার্স্ট সেক্রেটারি, করুণ দৃষ্টিতে প্রবেশপথের দিকে উঠে গেলেন আবার ফিরে এলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, এবারে কিছু একটা ঘটবে এবং আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।

অতঃপর সুদেহী এক ব্যক্তিকে প্রবেশপথ দিয়ে আসতে দেখা গেল। আমি চিনতে পারলাম তাকে– ইনি নিশ্চয়ই সেই রঘুনন্দন মিশ্র, ওয়াশিংটনএ ভারতীয় সভ্যতার একক সমাহার। এঁর হয়তো কোন চাকরিগত একটা পরিচয় আছে কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নেহাৎই একদিন এক ককটেল পার্টিতে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো আমার। অফিসঅফিসার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উনি কটূক্তি করছিলেন তখন। শুনলাম, এককালে ভারতীয় কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন ভদ্রলোক। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বুরোক্র্যাটদের কব্জার মধ্যে পড়ে যান। শোনা যায় ওঁর বাবা বারানসীর বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং মিশ্র নাকি সংস্কৃত সাহিত্যসমুদ্রে অবগাহন করে বসে আছেন। শৈশবের শিক্ষাকে ধন্যবাদ। গুজব শোনা যায় মিশ্র নাকি এই বিদেশে হিন্দুমতে বিবাহাদিতে পুরোহিতগিরিও করে থাকেন। ওঁর এই খ্যাতির কথাটা আমি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। কারণ সেদিন সন্ধ্যায় তিন কোর্স ককটেল গলাধঃকরণ করেও ওঁকে আমি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ থেকে অন্তত আধডজন সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে শুনেছি।

কোনরকম আঁচ না দিয়েই মিশ্রমশাই শবদেহের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঈষৎ মাথা নত কররেন। আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম, এমনকি অ্যাম্বাসাডরও। তারপর তিনি সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন। মনে হল ভগবদ্গীতার শ্লোক।

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

এবং

আশ্চর্যবৎ পশ্যন্তি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ বদতিত থৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যরচ্চৈনমন্যঃ শণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদন চৈব কশ্চিৎ ॥

প্রায় দশ মিনিট ধরে এই আবৃত্তি চলল। শোক দু'টির পারম্পর্য কিংবা বর্তমান অন্ত্যেষ্টিপর্বের সঙ্গে এদের সামগ্রিক সম্পর্কটি ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না আমি। মনে মনে ভাবলাম যাই হোক মিশ্রমশাই তো এক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ। উনিই ভাল বুঝবেন। ওঁকে বাদ দিলে রঙ্গরাওএর আত্মা হয়তো শেষকৃত্য থেকে বঞ্চিত হত। লি'স ফিউনারাল হোমের পাদ্রী হয়তো ভাবতেন আমাদের ভারতীয়দের বোধহয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোন প্রকরণ নেই অথবা মৃতকে কীভাবে সম্মান জানাতে হয় তা আমরা জানি না।

আবৃত্তি শেষ হবার পর মিশ্রমশাই আর একবার মাথা নুইয়ে প্রস্থান করলেন। এরপর শুরু হল ফেরবার পালা, অনেকটা পিছনমুখী ঢেউয়ের মত। মনে হল এবার দ্রুত পটপরিবর্তন হবে এবং সমাপ্তি নিকটবর্তী। ফিউনারাল হোমএর দু 'জন কর্মী রঙ্গরাওএর দেহ হলের বাইরে নিয়ে গেল।

সমবেত জনতা এবারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। অনর্গল কথা শোনা যেতে লাগল... জানেন এখানকার দাহ ব্যবস্থাটা একেবারে সর্বাধুনিক। হাড়মাসসুদ্ধ, পুড়ে একেবারে ছাই, মাত্র দু'মিনিটেই... মিশ্রমশায় একটা ডিনারপার্টিতে আটকে পড়েছিলেন, তাই... হতভাগা তুষারপাত আবার শুরু হল। আহা, কাল যদি অপিস বন্ধ থাকত। আচ্ছা অ্যাম্বাসাডর কি শেষ অবধি এখানে থেকে যাবেন? ইত্যাদি। শবদাহ যেখানে হচ্ছে, সেখানে জনস্রোতের সঙ্গে আমিও গেলাম। দেখি এককোণে কয়েকজন, অধিকাংশই মহিলা, জড় হয়ে কীসের ওপর যেন ঝুঁকে পড়েছেন। মুহূর্তের জন্য কী ব্যাপার দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ছোট্ট একটা গোঙানি শুনতে পেলাম। সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর। অনেকটা বিদ্যুৎশিখার মত, যা ক্ষণিকের জন্যে ঝলসে ওঠে কিন্তু গভীর দাগ কেটে দেয় আকাশের বুকে। গুমরেওঠা অনেক কথা যেন এক লহমায় উচ্চারিত হতে গিয়ে আবার তলিয়ে গেল। হ্যাঁ, এ সেই বিধবা, মিসেস রঙ্গরাওএর কণ্ঠস্বর। শেষ মুহূর্তে এক অর্ধস্ফুট আর্তির মধ্যে দিয়ে এই মানবী তার মানবিক দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেললেন। প্রবল সহানুভূতিতে আমি ওর দিকে চাইলাম। দেখলাম মহিলা বয়স্কাদের বুকে মুখ গুঁজে তাঁর এই ক্ষণিক অসংযমের জন্যে ক্ষমা চাইছেন। এই প্রথম আমার মনে হল, আমি বোধহয় কেঁদে ফেলব।

নিজেকে শান্ত করে সহানুভূতির বিচিত্র ধরন নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এমন সময়ও আসে যখন অপরের দুঃখ-বেদনা একটা অস্বস্তির ভাব জাগায়; তখন বিজ্ঞ মন দিয়ে বিষয়টাকে অস্বীকার করতে ইচ্ছে হয়। আবার কখনো এমন পরিস্থিতি হয় যে দুঃখীর দুঃখ ঘোচাতে না পারার অক্ষমতায় নিজেকে করুণ মনে হয়। কিন্তু যদিও আমি চোখের জল ফেলিনি তবু বর্তমান পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারলাম না। আমার কেমন যেন মনে হল মিসেস রঙ্গরাও বুঝি অপূর্ব সুন্দর একটা ছবির হারিয়ে যাওয়া অংশটি ভরিয়ে দিলেন। ঠিক ঠিক সময়ে তিনি নিজেকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করেছেন। বর্ষীয়সী মহিলাটি যেমন করে ওর মাথায় হাত বোলাচ্ছেন, ইচ্ছে হল, আমিও এগিয়ে গিয়ে তেমনি করে একটু হাত বুলিয়ে দিই সপ্রশংস সহানুভূতিতে। এ এক আশ্চর্য প্রসন্ন অভিজ্ঞতা।

সান্ত্বনাদাত্রীদের কাছ থেকে মিসেস রঙ্গরাও তাঁর অশ্রুসজল মুখ তুলে নিলেন। বর্ষীয়সী মহিলাটি গোটা পরিস্থিতিটা এক নজরে দেখে নিলেন। তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা বেদনায় আরো ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। মনে হল এঁকে চিনি, সশরীরে কিংবা ছবিতে এঁকে আমি কোথাও দেখেছি।

আমি মনে মনে তাঁকে চেনবার চেষ্টা করছি, দেখি একদল লোক অ্যাম্বাসাডরের পিছন পিছন হল ঘরে ঢুকলেন। অ্যাম্বাসাডর মহিলাটির কাছে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে শান্ত পদক্ষেপে প্রবেশপথের দিকে এগোলেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম– অবশ্য অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল– ভদ্রমহিলা অ্যাম্বাসাডরের স্ত্রী।

সাহনী আমার পাশে ফিরে এসে জানালেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ এবং বললেন তাড়াতাড়ি না বেরিয়ে গেলে ভিড়ের মধ্যে পড়ে যেতে হবে।

ফেরার পথে দেখি তুষার ঝরছে– মন্থর, অবসন্ন কিন্তু বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, গাছপালা– সব তুষারে ঢাকা। নিষ্পত্র লম্বা গাছগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে অতিকায় রুপোলি থাম। পাতাওলা গাছের পাতাগুলি সর্বাঙ্গে তুষার মেখে এক একটা সুতোর বলের মত ঝুলছে। মনে হচ্ছে প্রকৃতি যেন প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে। রঙ্গরাওয়ের ব্যাপার নিয়ে অনেকক্ষণ মগ্ন ছিলাম। তারপর সাহনীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভদ্রমহিলা কবে নাগাদ ভারতে ফিরবেন। ছ'মাসের মধ্যে তাঁকে যেতেই হবে নইলে, আপনি তো জানেন, গভর্নমেন্ট যাওয়ার খরচ দেবে না।'

'মিসেস রঙ্গরাও ইন্ডিয়াতে ফিরবেন না।'

'কী বলতে চান আপনি?'

সাহনী বুঝি আমার কণ্ঠস্বরে যে তীক্ষ্ণতা বা বিস্ময় ছিল তা বুঝতেই পারলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তিনি দেশে ফিরবেন না। সম্প্রতি ওঁর সঙ্গে শহরতলীতে আমাদের দেখা হয়েছিল। তিনি নানা কথায় আমার ওয়াইফকে বলেছেন যে যদি তাঁর হাসব্যান্ডের কিছু একটা ঘটে যায় তবে তিনি এদেশকেই নিজের দেশ হিসেবে নেবেন।'

'কিন্তু কেন? ভারতে কি ওঁর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই? এই বিদেশে টাইপিস্টের চাকরি করে তিনি ক'দিন চালাবেন?'

সাহনী তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না, বললেন, 'অবশ্যই তাঁর আত্মীয়-স্বজন আছে– বাবামা, জাননদ, ভাই- বোন সবাই। কিন্তু আপনি কেন বুঝতে পারছেন না যে কী জন্যে তিনি ফিরে যাবেন? দক্ষিণ ভারতের এক প্রান্তে অভাব আর অনটনের মধ্যে পচে মরতে? আত্মীয়-স্বজনেরা কি তাঁকে একটা মনোরম জীবন, তাঁর সন্তানকে সুশিক্ষা কিংবা আধুনিক সুযোগসুবিধার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে?'

আমি আর প্রশ্ন বাড়ালাম না। মিসেস রঙ্গরাও অবশ্যই নিজের দেখাশোনা করার অধিকারিণী কিন্তু সাহনী বিদায় না নেওয়া অবধি আমি এক গভীর নৈঃশব্দ্যে মৌন হয়ে ছিলাম।

...ভোরের দিকে ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখলাম, যথাবিহিত অনুষ্ঠানের পর তুষারের ওপর আমাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, আর আমি চিৎকার করছি, না– না, দয়া করে আমার জন্যে চিতা সাজাও, আগুন দাও, শিখা জ্বলে উঠুক... অ্যাম্বাসাডরপত্নী আমার ভ্রূর ওপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে আমার মাথাটাকে হিমের মধ্যে শুইয়ে দিচ্ছেন। মিসেস রঙ্গরাও আর লতিকা মহিলার দু'পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে আর কী এক বোঝাবুঝির একাত্মতায় মুখ টিপেটিপে হাসছে।

জেগে উঠে আমি লতিকাকে দেখতে পেলাম, হাতে সকালের খবরের কাগজ। সে আমাকে সুসংবাদটা দিল, 'এটা দেখেছ কি? কান্সএর দোকান ওয়াশিংটনএর জন্মদিন উপলক্ষে সেল্এ রূপোর পালিশ দেওয়া ছুরিকাঁটাচামচ সব মাত্র পঞ্চাশ ডলারে দিচ্ছে...।'

অনুবাদ **সুনীল আচার্য**

লেখক পরিচিতি

কিশোরীচরণ দাসের জন্ম উড়িষ্যার কটকে ১৯২৪ সালে। তিনি ইংরেজি ও ওড়িয়া– দুই ভাষাতেই লিখে থাকেন। ওড়িয়া ভাষায় লেখা তাঁর শ্রেষ্ঠ বই: *Bhanga Khelana* (1961), *Ghara Bahuda* (1968), *Manihara* (1970), *Thakura Ghara* (1975), *Taranga* (1997) ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষায় লেখা: *Death of an Indian* (1984), *The Midnight Moon and Other Stories* (1993) ইত্যাদি। কর্মজীবনে কিশোরীচরণ দীর্ঘকাল ভারত সরকারের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। ফলে কর্মোপলক্ষে পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন এই লেখক। কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী ও চিন্তামণি সতপতীর পরবর্তী প্রজন্মের প্রধান লেখক হিসেবে কিশোরীচরণ mvwnZ¨ GKv‡Wwg পুরস্কারসহ অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কারে ইতোমধ্যেই নন্দিত। এখানে তাঁর *Death of an Indian* গল্পটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ

Standard Chartered

When businesses succeed, livelihoods flourish.

In 2009, we took the initiative to be first to align with the World Bank Group in boosting global trade flows. Since then, we have continued to be proactive in encouraging growth across our markets. As trade is the lifeblood of the local economy, our commitment does more than protect businesses. It stimulates the communities that depend on them.

Here for good

Discover more at
standardchartered.com/answers

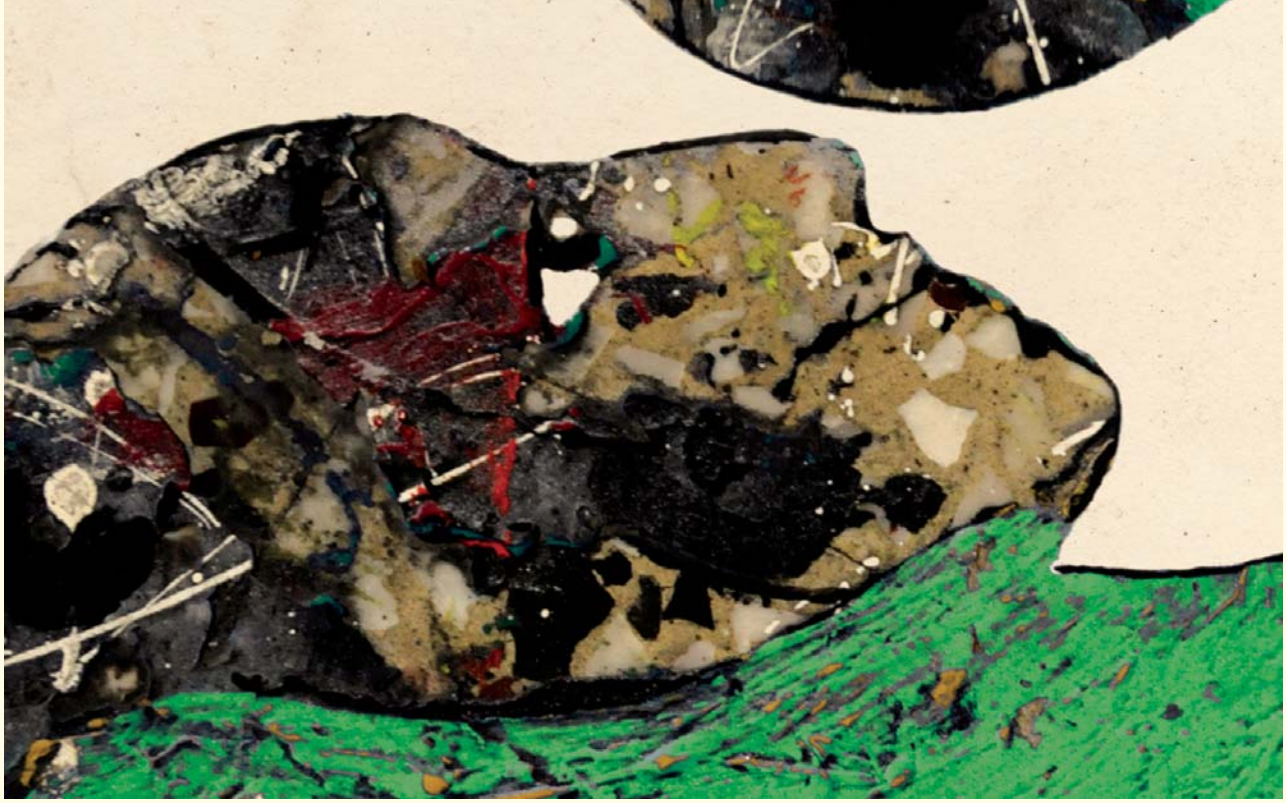

ছোটগল্প

মন্বন্তর

অমর মিত্র

কবি মধুসূদন আর হতভাগিনী হেনরিয়েটা সোফিয়া হোয়াইট টের পেয়েই গিয়েছিল, এ জীবন আর নয়, ফুরিয়েছে জীবনের মধু। কবি মধুসূদন অভাবে, রোগের ভারে জীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। কাব্যসরস্বতী তাঁকে যশ দিয়েছিল, অন্ন দেয় নাই। শরীর অসুস্থ। সন্তানের মুখে অন্ন নেই, ক্ষুধায় কাঁদে। উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য কবিকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। গঙ্গা তীরে রাজবাড়ি। অলিন্দ থেকে কবি মধুসূদন দেখতে পান নদী চলেছে সাগরের দিকে। দেখতে পান সাগর থেকে তুমুল উচ্ছ্বাসে ফিরছে নদী। সাগর থেকে ফিরছে সে পরিপূর্ণ হয়ে। তাঁর মনে পড়ে সাগরের ওপারের কথা। হেনরিয়েটা তাঁর বহুদিনের সঙ্গিনী। মাদ্রাজে রেবেকা আর চার সন্তানকে ছেড়ে, প্রায় পালিয়ে কলকাতা চলে আসার পর হেনরিয়েটাও জীবনসমুদ্রে ভাসল তাঁর সঙ্গে। রেবেকার সঙ্গে আইনসম্মত বিচ্ছেদ না হওয়ায় হেনরিয়েটা সোফিয়া নামের পাশে ডাট লিখতে পারেনি, মধুর স্ত্রীর হতে পারেনি, অথচ সন্তানের জননী, মধুর দুঃখময় জীবনের সঙ্গিনী। এখন রোগজর্জর কবি মধুসূদন ও হেনরিয়েটা প্রশস্ত অলিন্দে বসে ধীর প্রবাহিনী গঙ্গার দিকে চেয়ে। নদী চলেছে সাগরে। গঙ্গার পশ্চিমকূলে আছেন তাঁরা। গঙ্গার পশ্চিমকূল বারানসী সমতুল। বারানসীর কথা শুনেছে হেনরিয়েটা। সব তার প্রিয়তম মধুর কাছে। রাজা জয়কৃষ্ণের এই বসতবাটি, নিস্তব্ধ প্রকৃতি হেনরিয়েটাকে যেন এই সায়াহ্নে অদেখা বারানসীর রূপ প্রত্যক্ষ করায়। বারানসী হিন্দুর পবিত্র তীর্থ, বারানসীর গঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী, মানুষের সমস্ত পাপ হরণ করে এই দুঃখের পৃথিবী থেকে মুক্তি দেয়। গঙ্গা যেন ঈশ্বরপুত্রের অন্য এক রূপ। ভরা গঙ্গার রূপ এক, আর নিঃস্ব গঙ্গা-তীরের রূপ অন্য, ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরপুত্র বেরিয়ে আসেন জল-তল থেকে। সেই চেহারার ভিতর নিজেদের যেন দেখতে পায় মধু, হেনরিয়েটা। আষাঢ় মাস পড়েছে ক'দিন আগে। মধু আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রাচীন কবির কাব্যের কথা বলেছিল হেনরিয়েটাকে। সেদিন আকাশে মেঘ এসেছিল।

বৃষ্টি হয়নি। এদেশের প্রাচীন কবি কালিদাসের মেঘদূতমের কথা শোনাতে শোনাতে মধু বলেছিল, কবির ওই কল্পনা মধুর, কিন্তু পৃথিবী অত মধুর নয় প্রিয়তমা, আমি কেন অমর স্বপ্নের কথা ভাবতে পারিনি এ জীবনে? কোন স্বপ্ন প্রিয়তম?

মেঘদূতমের পৃথিবী কত সুন্দর, আমি অমন পৃথিবীতে তো জন্মাইনি।

হেনরিয়েটা মধুর কথা শোনে আর অভিভূত হয়। মধু শোনায় যক্ষের বিরহ-বেদনার কথা। শোনাতে শোনাতে বলে, বিরহ সত্য, কিন্তু আমি যে দেখেছি অন্য পৃথিবী, অপমান আর ক্ষুধার পৃথিবী।

হেনরিয়েটা চুপ করে থাকে। সে সামান্য রমণী। মধুকে ভালবেসে মধুর ভালবাসা পেয়ে সে ধন্য। মদুর মননের কাছাকাছি যেতে চায়, পারে না, তাই শান্ত্ব হয়ে শোনে। মধু কোন পৃথিবীর কথা বলতে চায় তা সে ধরতে পারে। মধু বারবার শোনায় মেঘনাদের মৃত্যুর কথা। সে দেখেছে জগৎটাকে ওইভাবে। বিড়বিড় করে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে মধু উচ্চারণ করতে থাকে,

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষেদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে...
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে ॥

নিজের রচনা মেঘনাদ বধ কাব্যের অন্তিম এই হাহাকার উচ্চারণের সময় তার দু'চোখ আর্দ্র হয়ে আসে। হেনরিয়েটা অন্যদিকে মুখ ফেরায়। এই মস্ত দালানবাটিতে কত কৌতর। তারা চুপ করে আছে। সারিসারি বসে আছে খিলানে খিলানে। কবি আর হেনরিয়েটার কথোপকথন তাদের নিস্তব্ধ করেছে।

মধু বলল, হেনরিয়েটা, তোমার মাদ্রাজের কথা মনে পড়ে?

হেনরিয়েটা বলল, তোমার কি মনে আসে মাদ্রাজ সিটির কথা?

এখন মনে পড়ছে, তোমার রেবেকার কথা মনে পড়ে?

হেনরিয়েটা বলল, আমার কিছুই মনে পড়ে না।

সে কি অভিশপ্ত করেছিল তোমাকে আমাকে?

হেনরিয়েটা বলল, কবি তুমি বিশ্বাস কর অভিশাপে?

জানি না আমি বিশ্বাস করি কিনা, কি ন্তু এখন মনে হয় প্রতারণা করেছিলাম রেবেকা ও আমার চার সন্তানকে।

হেনরিয়েটা বলল, আমার ভালবাসা তাহলে কি মিথ্যা হত?

মধু বলল, ওদের কথা এখন মনে পড়ছে কেন হেনরিয়েটা?

তোমার অন্তরের কথা তুমি জান, কিন্তু এও সত্য প্রেমহীন দাম্পত্য কি তোমাকে সুখী করত? রোগজীর্ণ হেনরিয়েটার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। রেবেকার তার প্রেমের বাধা হয়ে উঠেছিল। মধু তো সিদ্ধান্ত্ব নিয়েই ফেলেছিল রেবেকাকে ছেড়ে আসবে না। বাড়িতে তার নতুন মা তাকে গঞ্জনা দিচ্ছিল, যা তুই, ওই ব্ল্যাক নেটিভটার সঙ্গে ভেগে যা, আমি ওই নেটিভটাকে সহ্য করতে পারি না, বউ আছে, আবার তোকে ধরেছে। উফ! কী দিন গেছে সেইসব। রেবেকা তার সতীন, তার কথা ভুলতে চায় সে। রেবেকার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল সে পোয়েটকে। কবির দিকে প্রেমময় দৃষ্টিতে তাকায় হেনরিয়েটা। মধুসূদন নিশ্চুপ। শীর্ণ শরীরের দীপ্তিময় দু'টি চোখ নিমীলিত। হেনরিয়েটা বলল, তুমি কি আমার ভালবাসায় তৃপ্ত হও নাই?

মধুসূদন তার শীর্ণ দক্ষিণ হস্তটি হেনরিয়েটার মাথায় রাখল। কী সুন্দর সোনালি চুলের সোনালি চোখের অ্যাঞ্জেলকে সে দেখেছিল মাদ্রাজে। মাতৃহীন কিশোরী। কী ছিল তার প্রেমময় চাহনি। দেখামাত্র তাকে মন দিয়ে ফেলেছিল। বিবাহিত পুরুষ মাইকেল এম. ডাট। বিবাহ করেছে মাদ্রাজেরই এক শ্বেতাঙ্গিনীকে। রেবেকার সঙ্গে বিবাহে মাদ্রাজের শ্বেতাঙ্গ সমাজ খুশি হয়নি। দেশি কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ কেন শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করবে? লোকটি কবি। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে, অসাধারণ ওর পাণ্ডিত্য, কিন্তু কালো মানুষ তো। সেই বিবাহিত পুরুষের প্রেমে পড়ল কিনা সদ্য যুবতী এক শ্বেতাঙ্গ কন্যা!

নির্জন বাংলো বাড়িতে আচমকা মধু চলে এল। মধুসূদন নাকি এসেছিল হেনরিয়েটার বাবা তার শুভানুধ্যায়ী জর্জ জাইলস হোয়াইটের সঙ্গে দেখা করতে। সেই কথা বলেছিল হেনরিয়েটাকে। মিথ্যা। সাতচলিশ বছরের জর্জ হোয়াইট তার কন্যা হেনরিয়েটার চেয়ে বয়সে ছোট হেনরিয়েটার সৎ মা, নতুন বউকে নিয়ে গিয়েছিল চার্চে। সেদিন ছিল রবিবার। রবিবার অপরাহ্ন বেলায় চার্চে গেছে সবাই। হেনরিয়েটার পরের দুই ভাই টমাস আর আর্থারও। সমবয়স্ক নতুন মা সহ্য করতে পারত না হেনরিয়েটাকে। সেদিন সকাল থেকে স্টেপ মাদারের সঙ্গে বার বার কলহে জড়িয়ে পড়ছিল হেনরিয়েটা। বাইরের মেয়েটি এসে বাবাকে দখল করে নিয়েছিল। কলহের সময় নতুন মায়ের পক্ষ নিত বাবা। বাবার প্রতি অভিমানও তাই হয়েছিল প্রবল। পরিবারের সঙ্গে চর্চে না গিয়ে বাড়িতে একা বসেছিল বিষণ্ন মনে।

স্ত্রী রেবেকা আর সন্তানদের নিয়ে মধু গিয়েছিল চার্চে। গিয়েছিল হেনরিয়েটার সঙ্গে দেখা হবে সেই আশায়। মি. হোয়াইটের সঙ্গে তাঁর কন্যাকে না দেখে মধু একা ফিরে এসেছিল রেবেকাদের চার্চে পৌঁছে দিয়ে। হেনরিয়েটা প্রেয়ারে নেই। তার সঙ্গে কথা বলতে মধুর ভাল লাগে। মাতৃহীন কন্যাটির প্রতি তার এক ধরনের স্নেহ আছে। তাকে নিজের কবিতা পড়ে শোনায়। বায়বনের কথা শোনায়। হেনরিয়েটা প্রেয়ারে আসেনি তার বাবা এবং সৎ মায়ের সঙ্গে। অথচ সেই সোনালি চুলের কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে তাই তো চার্চে যাওয়া। হেনরিয়েটা বাড়ি আছে শুনল ওর বাবার কাছে, শরীর ভাল নেই। মধু চলে এসেছিল ইউরোপিয়ান কলোনিতে।

আমি জানি না আমি কী করব, মাই মাদার ইজ আ বিচ। হেনরিয়েটা তার সোনালি চুলে ভরা মাথাটি ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বিপর্যস্ত গলায় বলে উঠেছিল, মি. ডাট, কোনদিন শুনবে হেনরিয়েটা নেই, সি কমিটেড সুইসাইড।

এ তুমি কী বলছ হেনরিয়েটা, আমি মি. হোয়াইটকে বলব।

নো, হু ইজ মি. হোয়াইট, আমার বাবা মি. হোয়াইট মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানিশ হয়ে গেছে, এক যাদুকরী তাকে ভেড়া করে দিয়েছে, তুমি দেখতে পাও না মি. ডাট?

মধু তার পাশে গিয়ে বসেছিল, তার সোনালি চুলের উপর হাত রেখে বলেছিল, দেখ, তোমার বাবা তোমার কাছেই ফিরবে, তোমার স্টেপ মাদারও রিয়ালাইজ করবে সব।

ইউ আর রং, তুমি আমাকে স্তোক দিচ্ছ মি. ডাট, মাই ফাদার ইজ আ শেমলেস পার্সন, কী করে তার মত একটা এজেড পার্সন মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে নিয়ে ঘরে দরজা দেয়, আমরা, আমি আর আমার দুই ভাই টমাস ও আর্থার তখন বাইরে দাঁড়িয়ে, ওরা বালক, ওরা জানে ওদের বাবা একটা উইচের কবলে পড়ে গেছে, সি ইজ আ হোর, আমাদের সামনেই বাবার সঙ্গে যা করে, ওহ গড, আমি কী করব, আমি তো সুইসাইড করব ভেবেছিলাম, ইউ সেভড মি দিজ টাইম, কিন্তু আমি করব, করবই।

মধু কিছু বলেনি, বুঝতে পারছিল হেনরিয়েটা বড় হয়ে গেছে। তিন বছর আগের বালিকাটি আর নেই। বুঝতে পারছিল হেনরিয়েটার ভিতর বিদ্বেষ জন্মেছে তার সৎ মায়ের প্রতি। যা বলছিল হেনরিয়েটা সোফিয়া, মধু শুনছিল। শুনছিল, হেনারিয়েটা একটা গাছের বিষাক্ত বীজ সংগ্রহ করে ফেলেছে তাদের মেডসা ভের্সেন্টকে দিয়ে। আর একটু বাদে, প্রেয়ার টাইম শেস হলে সে ওটা খেয়ে ফেলত। মধু সেই বিষাক্ত বীজের মোড়কটি কেড়ে নিয়েছিল হেনরিয়েটার কাছ থেকে।

সেই হল অন্তরঙ্গতার শুরু। মি. হোয়াইট এবং তাঁর স্ত্রীর অসম্মতি ছিল না মেলামেশায়। তারা তো মেয়েটিকে গা থেকে কীটপতঙ্গের মত ঝেড়ে ফেলতে চায়। সেই হেনরিয়েটা আর বিবাহিত কৃষ্ণাঙ্গ মাইকেল এম. ডাটকে নিয়ে কথা উঠতে লাগল। রেবেকার কোলে তখন চার সন্তান, কন্যা মার্থা বড় হয়ে উঠছে। কী ঝড়ের দিন গেছে তখন। একদিন আচমকা তাদের বাংলো বাড়িতে হেনরিয়েটা বলে উঠল, আয়াম ইন লাভ মি. ডাট, ও গড, আয়াম ইন লাভ।

হু ইজ দ্যাট লাকি পার্সন? মধু জিজ্ঞেস করেছিল।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দু'জনে মুখোমুখি। লং স্কার্ট আর বস্নাউজ, মাথার সোনালি চুলের গোড়ায় একটি লাল রিবন। হেনরিয়েটা মাথা নামিয়ে বসে আছে। তখন বর্ষা গিয়ে সবদিকে কেমন প্রশান্তি। মধু আবার জিজ্ঞেস করেছিল, হু ইজ হি?

হি ইজ আ স্পেশাল পার্সন।

তুমি যখন তার প্রেমে পড়েছ, হি মাস্ট বি আ স্পেশাল পার্সন, সে কি আর্মিতে আছে?

নো মি. মাইকেল, হি ইজ আ সিভিলিয়ান।

তখন মধুসূদন জিজ্ঞেস করেছিল, আ ব্রিটিশ?

ডিয়ার মি. ডাট, হোয়াই ডু ইউ কাম হিয়ার এভরি ডে? আচমকা জিজ্ঞেস করে উঠেছিল হেনরিয়েটা, তুমি আমার কাছে আস কেন?

এমনি আসি, ইউ আর আ নাইস লেডি, তুমি লেডি হয়ে উঠছ দিনে দিনে, বিউটিফুল লেডি।

রেবেকার চেয়েও?

কী বলছ?

বলছি তোমার বউয়ের চেয়েও সুন্দর?

তুমি তোমার মত সুন্দর হেনরিয়েটা।

নো নো, পিজ টেল মি. হু ইজ বিউটিফুল, রেবেকা অর মি।

ইউ, ইউ অ্যান্ড ইউ, তুমি পরির মত সুন্দর।

ও মধু, আই লাভ ইউ, আয়াম ইন লাভ অফ মাইকেল এম. ডাট, আই লাভ ইউ, লাভ ইউ, ওহ গড, আই অ্যাম ইন লাভ।

হেনরিয়েটার সব মনে আছে। মধুসূদন সরতেও চেয়েছিল, তাকে বুঝিয়েছিল। সে এক বিবাহিত পুরুষ, হেনরিয়েটা কেন তাকে ভালবাসবে। রেবেকা কখনোই ডিভোর্স দেবে না, এক সঙ্গে দুই স্ত্রীর কথাও বলেছিল মধু রেবেকাকে। হেনরিয়েটা তার দাসীর মত থাকবে। তার মা বেঁচে থাকতে বাবা রাজনারায়ণ আরো দু'টি বিবাহ করেছেন জেনেছে মধু। ভারতবর্ষে এমন ঘটে থাকে। প্রথম স্ত্রী হিসেবে রেবেকা অনুমতি দিলেই হবে। রেবেকা দেয়নি। বরং তার নাবালক সন্তানগুলি নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেও ফুঁসে উঠেছিল। তারপর তো মধুর পিতৃবিয়োগ, কলকাতায় ফিরে আর মাদ্রাজে না যাওয়া।

হেনরিয়েটা তুমি মাদ্রাজের কথা সবই ভুলে গেছ?

হেনরিয়েটা: আমার মনে পড়ে কবি তোমার কপোতাকসোর কথা, তুমি যে ছবি আঁকিয়াছিলে তোমার কবিতায়।

তুমি রেবেকার কথা ভুলে গেছ হেনরিয়েটা?

কপোতাকসো নদের কথা তোমার মনে পড়ে না কবি?

তোমার মনে আছে হেনরিয়েটা? কবির পা-ুর মুখে আলো ফুটল বুঝি।

তোমার কত লেখা আমার মনে আছে মাই ডিয়ার পোয়েট!

কপোতাক্ষর কথা শোনাও দেখি। কবির চোখমু খে প্রত্যাশা ফোটে। চুপ করে তাকিয়ে থাকেন হেনরিয়েটার দিকে। হেনরিয়েটার দু'চোখ বোজা, মুখের উপর কালো ছায়া। দম আটকে আছে যেন সে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। গঙ্গাতীরেও বাতাস বুঝি অপ্রতুল। ওই দেখা যায় মা জাহ্নবীর আর এক রূপ, প্রাণদায়িনী গঙ্গা, তার ভিতরে কি কপোতাক্ষর জল নেই? গঙ্গার উপরে বর্ষার মেঘ, সাড়া পড়েছে প্রকৃতি ও প্রাণের ভিতর। গাঁয়ে গাঁয়ে ডাক এসেছে মাটির। বীজ বপনে এস মানুষ।

হেনরিয়েটা তখন ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছিল,

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
... ...
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদদ লে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ স্রোতোরূপি তুমি জন্মভূমি- স্তনে!
আর কি হবে দেখা?– যত দিন যাবে,...

বলতে বলতে হেনরিয়েটার গলা বুজে আসতে লাগল। শ্বাস নিতে লাগল জোরে জোরে। থেমে গেল সে।

তোমার কষ্ট হচ্ছে হেনরিয়েটা? কবি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করেন।

হেনরিয়েটা মাথা নাড়ল, না কবি, সবটা মনে পড়ছে না, আর তুমি ভাল থাকলে আমি ভাল থাকি প্রিয়তম।

আমার সেই কপোতাক্ষর দেশে এত ফসল, এত ধান্য, কলাই, এত ফলফলারি, এবার আম হ য়েছিল অনেক অনেক, আমার জন্মভূমি আম ধান নারিকেলের দেশ, এ দেশে এত নদী, স্রোতোস্বিনী, রূপালি মৎস্য খেলা করে সেখানে, নদীজ লের শস্য তা, নদীতীর কত সবুজ, সবই আমাদের শাকান্ন, ভাবিনি অন্নের অভাবে ক্রন্দন করবে আমার সন্তান।

হেনরিয়েটা: থাক কবি, সবাই অন্ন পাবে, কবি তুমিই আমাদের অন্ন, অন্ন, অন্ন, ধান্য, নারিকেল, অমৃতফল।

আমাকে গোপন করলে কী হবে প্রিয়া, এখন ধান্য রোপণের কাল, বর্ষা সমাগত, আমি দেখতে পাচ্ছি মাটি ধারণ করছে ফসলের বীজ, এই ফসল পাকার কালে, সামনের হেমন্তে নবান্নে আমাদের অন্নাভাব ঘুচবে, আমার সন্তান আবার থাকবে দুধেভা তে। ধীরে ধীরে কবি বললেন।

অন্নহীন চাষা যেন বসে ছিল বর্ষার মেঘের দিকে চেয়ে। তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় বুঝি হেনরিয়েটা। চাষা তার সন্তানের জননীর চোখে মায়া-কাজল এঁকে দিচ্ছিল ক্রমাগত।

কবির স্বপ্ন সত্য হবে কবি। হেনরিয়েটা বলেছিল।

আমি তুমি ফসলের খেতে নেমে যাব আমাদের সন্তানদের নিয়ে, হেনরিয়েটা হেমন্তের শস্য ক্ষেত্রের কী অপার সৌন্দর্য, সে যেন কাব্যসরস্বতীর আর এক রূপ, লক্ষ্মীসর স্বতী একাকার হয়ে যায় হেমন্তের পূর্ণতায়, খর্জুর বৃক্ষ রসবতী হয়ে ওঠে, মা জাহ্নবী সমস্তদিন ধরে পরমান্ন রাঁধেন, পিঠেপুলি ক রেন কত রাত জেগে। সবই সন্তানের জন্য। তুমিও তেমনি হয়ে উঠবে হেনরিয়েটা।

হেনরিয়েটা: তোমার কথায় আমার ভিতরে কল্পনা জন্ম নেয় কবি।

তোমার কি সত্যই মনে নেই আর এক হতভাগিনীর কথা?

হেনরিয়েটা: মনে করিলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে কবি, সে যদি আমাকে গ্রহণ করিত, জীবন অন্য রকম হইত হয়তো, তুমি তাহাকে এখনো মনে রাখিয়াছ, তাহার কথা ভাব কবি?

না, এখনই মনে এল সে, মনে পড়ে সেই সমুদ্রপ্রমাণ তৃষ্ণার কথা, মার্থা, ফিবি তাদের মা রেবেকা, রেবেকার কান্না আমি টের পাই হেনরিয়েটা।

হেনরিয়েটা: তুমি কি বিদায়ঘাটের কথা ভুলিয়াছ কবি, রিভার কপোতাকসো?

উত্তরপাড়ার গঙ্গার ধারে বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরি ঘরে পীড়িত স্বামী স্ত্রী, হেনরিয়েটার কথায় মধুসূদন মাথা নামিয়ে থাকে। শীর্ণ দেহ, সর্বাঙ্গে মরণের ছায়া ঘনিয়েছে দু'জনের ভিতর। অভুক্ত সন্ত্মান দু'টির মলিন মুখের দিকে মধু তাকাতে পারে না। বিদায়ঘাটের কথা বলে হেনরিয়েটা চুপ। সমস্ত্ম দেহ জুড়ে মৃত্যু যন্ত্রণা নেমেছে তা টের পেয়ে গেছে হেনরিয়েটা। কত আর সহ্য করবে এ দেহ, কিন্তু তার কিছু হলে কে দেখবে কবিকে? ওই যে রোগ শয্যায় শায়িত কবি বিনবিন করে মহাকবিকে স্মরণ করছে।

To-morrow, and to-morrow, and to- morrow
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!

হেনরিয়েটা বলে ওঠে, ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথ।

মধুসূদ বিড়বিড় করছিল ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে,

Life's but a walking shadow; ...
..... it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
signifying nothing.

কবির অন্ন ছিল না। অভাব হয়েছিল। অথচ অন্নই প্রাণ, অন্নই জীবন, এই সামান্য জীবন। অন্নই কাব্যসরস্বতী, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি, বাল্মীকি, দান্তে, বায়রন, মিল্টন। সে কেমন অভাব? মধুর মৃত্যুর সত্তর বছর পরে ৪৩এর ম ন্বন্তরে যে অভাব মরেছিল মানুষ, সেই অভাব। ফ্যান দে মা, ফ্যান দে... 'দেশে উঠল হাহাকার... ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কি আইল দেশে পুনর্বার?'

মন্বন্তরের ক্ষুধা আর তৃষ্ণা নিয়ে গেল কবি আর তার আগে হেনরিয়েটা। আগামী হেমন্তে যে নবান্ন হবে, সেই নবান্নের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গেল তারা। নবান্ন আজও হয়নি। কবি যদি অন্নহীন হয়, নবান্ন কী করে হয়?

অমর মিত্র ভারতের কথাসাহিত্যিক

सत्यमेव जयते

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জন্ম

২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০

কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ, সাংবিধানিক এসেম্বলির সদস্যবর্গ, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে গভর্নমেন্ট হাউসের আলোকময় ও সুউচ্চ দরবার হলে এক সর্বোচ্চ ভাবগম্ভীর ও ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে বৃহস্পতির সকাল ১০.১৮ মিনিটে ভারত একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হয়। সকাল ১০.২৬ মিনিটে প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ শপথ গ্রহণ করেন।

গভর্নমেন্ট হাউসে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এসে পৌঁছনোর বহু আগে থেকেই জনতা চত্বরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন; নিকটবর্তী গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ বুধবারেই এখানে এসে পৌঁছন।

দরবার হলের ভেতরে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ড. সুকর্ণ ও তাঁর স্ত্রী, কূটনৈতিক কোরের বর্ণোজ্জ্বল আনুষ্ঠানিক পোশাকে সুসজ্জিত সদস্যবৃন্দ এবং ভারতের আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিহিত মন্ত্রীবর্গসহ পাঁচ শতাধিক অতিথি সমবেত হয়েছিলেন।

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির আগমনের কয়েক মিনিট আগে পৌঁছনো প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার তদারকি করেন।

বল্লমবাহী টকটকে লাল পোশাকে সজ্জিত গভর্নমেন্ট হাউসের দেহরক্ষীরা হলের সিঁড়িতে সারিবদ্ধভাবে দ-ায়মান। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির আগমনের পূর্বে চলে কুশল বিনিময়। গোটা হলের পরিবেশ ছিল উত্তেজনা ও প্রত্যাশায় ভরপুর।

৩১ বার তোপধ্বনি অভিবাদনের পর সিংহাসনের ডাইনে পণ্ডিত নেহরুর আসনের বরাবর ড. সুকর্ণ ও তাঁর স্ত্রী বসেছিলেন। গভর্নর জেনারেলের ব্লু স্ট্যান্ডার্ড নমিত হয়ে রাষ্ট্রপতির লাল্ল সোনালি পতাকা উত্তোলিত হল। চত্বরের সৈন্যরা অস্ত্র সংবরণ করে প্রজাতন্ত্রকে অভিবাদন জানালেন। ব্যান্ডে বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত *জনগণ মন...*। সাংসদদের মধ্যে কয়েকজন *বন্দে মাতরম্* বলে চিৎকার করে উঠলেন।

সভাস্থ সকলে আসন গ্রহণ করলেন। রাষ্ট্রপতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, প্রথমে হিন্দিতে, পরে ইংরেজিতে। ভাষণে পাঁচ মিনিটের চেয়ে কম সময় ব্যয়িত হল। ১০.৩৩ মিনিটে স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী এইচ ভি আর আয়েঙ্গার মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে এসে অনুমতি চাইলেন যে, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের উদ্‌ঘোষণা জানিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি এবং ভারতের গেজেটে সেটি প্রকাশ করা এবং সকল সেনানিবাস ও প্রধান প্রধান সেনাছাউনীতে সেটি পাঠ করা হবে কিনা।

রাষ্ট্রপতি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। রাষ্ট্র সচিব অবসৃত হয়ে আবার এগিয়ে এসে অনুষ্ঠান সমাপ্তির জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

সিডিআর কে ভি সিং (অব.), ভারতীয় ফ্ল্যাগ ফাউন্ডেশনএর সংগ্রহ থেকে

৩ জানুয়ারি, ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে বাংলাদেশী ব্যান্ড *চিরকুট*এর ফিউশন সংগীত পরিবেশন

১০ জানুয়ারি, ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে শিল্পীদম্পতি সালমাসা জেদ আকবরের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন

১১ জানুয়ারি, ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে মিসেস তানজিনা তমার একক সংগীত পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra January 2014

सत्यमेव जयते

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ভিসা সেবা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে আউটসোর্স করা হয়েছে। এসবিআই বাংলাদেশে ছয়টি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পরিচালনা করে থাকে। এগুলি হচ্ছে: ১. আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা, ২. আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা, ৩. আইভিএসি, চট্টগ্রাম, ৪. আইভিএসি, সিলেট , ৫. আইভিএসি, খুলনা এবং ৬. আইভিএসি, রাজশাহী।

আইভিএসি-তে সকল কর্মদিবসে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। ভিসা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর পাসপোর্ট বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ফেরত দেওয়া হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির পূর্ণ বিবরণ **www.ivacbd.com** এবং **www.hcidhaka.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ।

†níjvBbmg~n: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকায় আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন সংক্রান্ত ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্যে একটি কাউন্টার রয়েছে।

আইভিএসি, গুলশান-এর হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: info@ivacbd.com, এবং visahelp@ivacbd.com; ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৬৩২২৯; টেলিফোন: +৮৮০২ ৮৮৩৩৬৩২, +৮৮০২ ৯৮৯৩০০৬ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ভিসা হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in; টেলিফোন: +৮৮০২ ৯৮৮৮৭৯২ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

জনসাধারণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ভারতীয় ভিসা পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও ভিসা ফি দিতে হয় না। আইভিএসি প্রক্রিয়া ফি বাবদ আবেদনপত্র পিছু যে চারশত টাকা নেয়, তা ফেরতযোগ্য নয়।
- ভিসা আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্যের নির্ভুলতার ব্যাপারে আবেদনকারী দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্রে যে কোন ভুলের জন্য আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্যতোলা ছবি (৩ মাসের বেশি পুরনো নয়) সংযোজন করতে হবে।
- আবেদনকারী ভারতভ্রমণে কোন্ শ্রেণীর ভিসা চান তার উলেখ করতে হবে–
  ১. মনে রাখতে হবে যে, একান্ত জরুরি না হলে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি নেই।
  ২. নিয়মিত ও পূর্ব-নির্ধারিত চিকিৎসা সেবার জন্য কেবল মেডিক্যাল ভিসার জন্যই আবেদন করতে হবে।
  ৩. রোগীর সঙ্গে মাত্র ৩ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট যেতে পারবেন এবং তাঁদের একত্রে ভিসার আবেদন করতে হবে।
  ৪. ব্যবসায়ের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিজনেস ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভুল তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানের জন্য আবেদনকারীরাই দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে ভিসাপ্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোনও সময় কোন কারণ ছাড়াই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করলে ভিসাপ্রাপ্তি সহজ হবে।

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত